কাব্য-মীমাংসা

ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী
সম্পাদনা :
ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বুক হোম
৩২ কলেজ রো ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

জুলাই ১৯৭০

প্রকাশক :

বিশ্বজিৎ মজুমদার

গ্রন্থগৃহ

২২সি, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :

হীরালাল মুখোপাধ্যায়

কনটেমপোরারী প্রিন্টার্স

১৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :

সুবোধ দাশগুপ্ত

আমাদের সুদার্শনিকা গবেষণারতা

দুই কন্যারত্ন

শ্রীমতী ঋতাবরী রায়, এম. এ.

অধ্যাপিকা শ্রীমতী রুচিরা মজুমদার, এম. এ.

—প্রাণাধিকাসু

সূচী

ভূমিকা		অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়	
প্রথম অধ্যায়	:	কাব্যের স্বরূপ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	কাব্যানন্দের প্রকৃতি	১০
তৃতীয় অধ্যায়	:	কাব্যে ভাবপ্রকাশ	৪৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	দুঃখমূলক নাটকের সৌন্দর্য	৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	:	আর্টে বাস্তবিকতা	৬৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	হাস্য-কৌতুক	৬৮
সংযোজন			
সপ্তম অধ্যায়	:	ভারতীয় সৌন্দর্য দর্শন	৭২
অষ্টম অধ্যায়	:	সৌন্দর্য-দর্শন প্রসঙ্গে আধুনিক মতবাদ	৮০
নবম অধ্যায়	:	শিল্পের সামাজিক মূল্য	৮৮
পরিশিষ্ট—ক	:	পুস্তকের তালিকা	৯১
পরিশিষ্ট—খ	:	সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে প্রধান প্রবন্ধের তালিকা	৯৩

নিবেদন

উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্থ ধরণীর সকল সুন্দর—

আমার দেবোপম স্বামীর রচিত নন্দন-তত্ত্বের অমূল্য গ্রন্থ 'কাব্য-মীমাংসা' প্রকাশিত হলো। বহু উৎসুক কাব্য-সাধকগণের ও আমার বহু দিনের আশা পূর্ণ হলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের তরুণ অধিকর্তা শ্রীদিব্যেন্দু হোতা ও কর্মচারীবৃন্দের সহৃদয়তায়।

পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রবাসজীবনমনীষার কিছু মণি-মানিক তুলে দিলেন দেশবাসীর হাতে। যদিও সে অগাধ রত্নভাণ্ডারের কতোটুকুই বা পৌঁছেচে তাঁর পরম প্রিয় সুহৃদমণ্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী, দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে? আরব্ধ কর্মরাশি অসমাপ্ত রেখেই যখন ঈশ্বর নিজেই ফিরিয়ে নিলেন সেই অনন্য প্রতিভাকে?

তবু জীবনের অনেকখানি দুর্গম পথ ভেঙ্গে এসে করুণাময় ভগবানের কৃপায় বারবার জেনেছি জ্ঞান-তপস্বী আনন্দময় আমার স্বামী তাঁর সাধনার মধ্যেই বিরাজিত আছেন—তাঁকে সম্পূর্ণ হারাই নি। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-নন্দন-তত্ত্ব ও সাহিত্য অনুরাগীরা 'প্রবাসজীবন' নামের স্বাক্ষর বিস্মৃত হননি—এই আমার পরম প্রাপ্তি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'ভূমিকায়' এই গ্রন্থটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও পূর্ণ করে দিয়েছেন বহু পরিশ্রমে ও যে সানন্দ আন্তরিকতায় তা ভুলবার নয়। ভগবানের অশেষ আশীর্বাদ এদের সবাকার জীবনে অক্ষয় হউক—এই প্রার্থনা।

আশাবরী চৌধুরী

ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী

জন্ম ঃ ১৩ই মার্চ্চ, ১৯১৬ মৃত্যু ঃ ৪ঠা মে ১৯৬১

।। ভূমিকা ।।

১. ব্যক্তি পরিচয়

১৯১৬ সালের ১৩ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁর পৈত্রিক নিবাস সাঁত্রাগাছি (হাওড়া)। পিতা স্বর্গত ডাক্তার মাখনলাল চৌধুরী কর্মসূত্রে বিহারে বক্তিয়ারপুরে প্রবাসী ছিলেন। প্রবাসজীবনের মাতা স্বর্গতা প্রভাবতী দেবী। প্রবাসজীবন পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টাচার্যবংশ তাঁর মাতামহকুল।

প্রবাসজীবন তাঁর স্কুল-কলেজের পাঠ শেষ করেন প্রথমে রায়বেরিলি সরকারী স্কুল ও পরে কলেজ থেকে। ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের জন্য তিনি বৃত্তি, স্বর্ণপদক ও অন্যান্য পুরস্কারাদি লাভ করেন।

১৯৩৯ সালে প্রবাসজীবন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম্. এস্‌সি পাশ করেন। অতঃপর চার বছর পরে, ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এবং ১৯৪৪ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই দর্শনে এম্. এ. পাশ করেন।

প্রবাসজীবনের প্রথম কর্মস্থল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি ছোট গ্রামে। নিজের উচ্চশিক্ষার কথা গোপন রেখে সেখানকার স্কুলে তিনি কিছুকাল প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

এর পর ১৯৪৪ সালে তিনি শিলং-এ সেন্ট এ্যান্টনি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দেন। এর পর কিছুকাল তিনি

পাঞ্জাবের একটি কলেজেও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে কাজ করেন। ১৯৪৫ সনে তিনি পদার্থবিদ্যায়, দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্য—এই তিন বিষয়ের অধ্যাপনার ভার নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে কাজে যোগ দেন।

১৯৪৫ সালে এ্যাডভোকেট স্বর্গত নলিনীকান্ত চৌধুরী এবং লেখিকা স্বর্গতা উষাবতী দেবী সরস্বতীর কন্যা শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরীর সঙ্গে প্রবাসজীবনের বিবাহ হয়।

শান্তিনিকেতনে বাসকালে প্রবাসজীবনের উচ্চতর বিদ্যাসাধনার অবকাশ ঘটে। ১৯৪৭ সালে তিনি কীট্‌সের সৌন্দর্য-দর্শন সংবন্ধে গবেষণা করে স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক ও ১৯৪৮ সালে তিনি বিজ্ঞানের দর্শন বিষয়ে গবেষণা করে গ্রিফিথ্‌ পুরস্কার পান। ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. আর. এস. বৃত্তি এবং ১৯৫১ সালে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ডি. ফিল. ডিগ্রি পান। পরের বছর, ১৯৫২ সালে তিনি মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৫৩ সনে প্রবাসজীবন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন বিভাগে প্রোফেসার এবং বিভাগীয় প্রধান রূপে কাজে যোগ দেন। এই সময় থেকে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই সময় থেকে তিনি দেশের এবং বিদেশের, সরকারী এবং বেসরকারী সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাবেন। কিছুকাল তিনি ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সম্পাদক রূপেও কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেন।

১৯৫৯ সালে প্রবাসজীবন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক অধ্যাপক (ভিজিটিং ফেলো) রূপে যোগ দেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থানে বক্তৃতার জন্য আহূত হন। এই সূত্রে তিনি ইংল্যাণ্ডে ইউরোপের অন্যান্য নানা স্থানে নানা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। বিদেশে সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

১৯৬০ সালে এথেন্সে চতুর্থ আন্তর্জাতিক নান্দনিক কংগ্রেস (International Aesthetics Congress) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে প্রবাসজীবন সহ-সভাপতি হন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বয়সে প্রায় তরুণ হলেও এই সময় তিনি আন্তর্জাতিক বুধমণ্ডলীতে সুপরিচিত এবং বহুসম্মানিত পণ্ডিত রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

দুঃখের কথা, এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা তিনি বেশি কাল ভোগ করবার সুযোগ পেলেন না। দেশে ফেরার অল্পকাল পরেই আবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্য আমন্ত্রিত হন। কিন্তু অকস্মাৎ মধ্যপথে তাঁর জ্ঞানসাধনার অকালে অবসান ঘটল। ১৯৬১ সালের ৪ মে তারিখে, মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে, গৌরবোজ্জ্বল জীবনমধ্যাহ্নে, বৃদ্ধ পিতামাতা, সহধর্মিনী ও শিশু পুত্রকন্যাদের রেখে প্রবাসজীবন পরলোকগমন করলেন।

বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবাসজীবন তাঁর যথার্থ পরিচয় দিয়ে যেতে পারেন নি। কঠিন সাধনার দ্বারা যখন তিনি তাঁর প্রস্তুতিপর্বটি সবে পার হয়ে এসেছেন, সেই সময়ই তাঁকে চলে যেতে হল। এই প্রসঙ্গে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক তারকনাথ সেন যা লিখেছিলেন, এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"I soon sensed his brilliance and there was something about him that drew me to him… I was totally unprepared for the sudden extinciton of such brilliant promise. It was with intense interest that I had been watching his career all these twenty years—his rise to fame as a teacher and philosopher …Not to speak of his books, the tally of his papers alone, published in foreign journals, would constitute a fine record for a young man of 44. No praise could be too high for the pains he took,

which I witnessed with my own eyes, to keep abreast of recent developments in western philosophy, of the study of one of which, the philosophy of Scienec, he was a pioneer in this country. Most of the time when he was not teaching he was reading or writing and in a way he martyred himself to his passion for knowledge···Prabasjiban's sudden and unexpected death, in particular, is an unspeakable tragedy."

মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের জীবনে বিদ্যার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রবাসজীবন যে সম্মান অর্জন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। তবু কেবল পাণ্ডিত্যেই যে প্রবাসজীবনের সত্য পরিচয় নয়, এ কথাটা জোর দিয়ে বলা দরকার। বিদ্যাবত্তার কারণে যেমন ক্রমশই তাঁর খ্যাতি দেশে-বিদেশে বিস্তার লাভ করছিল, ঠিক তেমনি গভীর সংবেদনশীলতা, সদাজাগ্রত কৌতূহলী মন, মার্জিত রসবোধ এবং প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের কারণেও— তাঁর সহজাত হৃদয়বত্তার কারণেও তিনি ছাত্র, সহকর্মী, বন্ধু, পরিচিত ও আত্মজনের মণ্ডলীতে সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন এবং সেই প্রীতির ক্ষেত্র ক্রমশই গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছিল। প্রবাসজীবনের অকালবিয়োগ বিদ্যার জগতে যেমন অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়েছে, মানব সম্পর্কের জগতেও তা একটি গভীর ও বেদনাদায়ক ক্ষত রেখে গিয়েছে।

প্রবাসজীবনের রচনাবলী থাকবে। কিন্তু প্রিয়জনের ব্যক্তিগত বেদনার ক্ষতচিহ্নকে আর ইতিহাস কতদিন ধরে রাখবে?

২. রচনাবলী

ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে প্রবাসজীবনের প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা কমপক্ষে দেড়শ'র মতো। প্রবাসজীবনের লেখার কাল দীর্ঘায়ত নয়। সময়ের পরিধি দিয়ে বিচার করলে তাঁর রচনার সংখ্যা আমাদের নিশ্চয়ই বিস্মিত করবে।

নিছক সংখ্যা হয়তো খুব বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা রচনার মান। বলা প্রায় বাহুল্যই হবে যে, প্রবাসজীবনের অধিকাংশ প্রবন্ধই সুচিন্তিত এবং সুলিখিত, উৎকর্ষের কারণে বিদ্বজ্জনের দ্বারা বহুপ্রশংসিত—অনেক প্রবন্ধ বিদেশের উচ্চ মানের পত্রিকায় প্রকাশিত।

সংখ্যাব প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। সংখ্যার বিপুলতা অবহেলার বিষয় নয়। সংখ্যার বিপুলতা থেকে আমরা রচয়িতার চরিত্রের বেগ সম্পর্কে ধারণা করতে প্যারি। সংখ্যার বিপুলতা থেকে আমরা প্রবাসজীবনের নিষ্ঠা ও আগ্রহের গভীরতা সম্পর্কে, তাঁর সাধনার ঐকান্তিকতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। বাঙালি বুদ্ধিজীবীতে সাধারণত আমরা যে শিথিলতা ও শ্রমবিমুখতা দেখতে পাই, প্রবাসজীবনে তার চিহ্নমাত্র পাব না।

প্রবাসজীবনের প্রবন্ধগুলির বিষয়বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। এর মূলে আছে তাঁর বিদ্যার নানামুখী ব্যাপ্তি—বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন, এই তিন বিষয়ে তাঁর অধিকার দূর-প্রসারিত। তাঁর কিছু প্রবন্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক। কিছু প্রবন্ধ দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ক। কিছু প্রবন্ধ বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে; প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানবিষয়ে প্রবাসজীবনের দার্শনিক মননের প্রকাশ। কিছু প্রবন্ধ নীতি বিষয়ক, অনেক প্রবন্ধ সরাসরি দর্শন বিষয়ক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশের দর্শনেই প্রবাসজীবনের অধিকার, দুই দেশের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে। সরাসরি সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধ কম, সাহিত্যের যে দিকটি দর্শনের সীমানাকে স্পর্শ করে, সেই দিকেই প্রবাসজীবনের আগ্রহ সমধিক।

এই আগ্রহের সূত্রেই প্রবাসজীবন সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন এবং কালক্রমে এই ক্ষেত্রটিকে তাঁর বিশেষ অধিকারের—স্পেশালাইজেশনের ভূমি করে নিয়েছেন।

স্পেশালাইজেশন সাধারণত একটি ভূমিতেই নিবন্ধ থাকে। সেং হিসেবেই সাহিত্যতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব, এই যৌথ ভূমিটির নামোল্লেখ করা যায়। অন্যথায়, আগ্রহ দিয়ে বিচার করলে, দার্শনিক বিজ্ঞানচিন্তার ভূমিটিরও কথা বলা দরকার। দুয়ের মধ্যে তাঁর ক্ষেত্রে বিরোধ ঘটে নি। একং দার্শনিক দৃষ্টি, কখনো তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কখনো তা শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজেকে নিবন্ধ করেছে।

বিজ্ঞানচিন্তা মননের যে স্তরে গিয়ে সহজেই দর্শনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে, প্রবাসজীবনের বিজ্ঞানচিন্তাও সেই অভিমুখী। অর্থাৎ তা দার্শনিকের চিন্তা। প্রবাসজীবনের দর্শনমুখী বিজ্ঞানচিন্তার পরিচয় দিতে গিয়ে আমেরিকার টাফ্‌ট্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক George Burch বলেছেন,—

"Philosophy, Dr. Chaudhuri maintains, is neither a synthesis of science nor something unrelated to science, but a higher level of thought which is implied by science and to which only the uncritical scientists fail to lead…"

প্রবাসজীবনের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলন কীভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক George Burch আরো বলেছেন,—

"The elaboration of Advaita Vedanta by a scholar who is a student of modern science rather than of the Sanskrit classics is further evidence that Vedanta is still a living philosophy…

it challenges the contemporary philosophies of other traditions as an account of the world and of ourselves."

আগেই বলেছি, সাহিত্য ও দর্শন এই দুই বিষয়ে অধিকার ও আগ্রহ থাকার ফলে শিল্পের ও সাহিত্যের দার্শনিক সমস্যাগুলি—নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের দুরূহ প্রশ্নগুলি প্রবাসজীবনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলন প্রবাসজীবনের চিন্তাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

আমেরিকার বিখ্যাত 'The Journal of Aesthetics and Art Criticism' পত্রিকাটি নন্দনতত্ত্বে আগ্রহী সকলেরই সুপরিচিত। শিল্পদর্শনের ক্ষেত্রে—নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন। প্রবাসজীবনের অনেক শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসজীবনের চিন্তায় যেভাবে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার মিলন ঘটেছে, সেই সম্পর্কে উক্ত পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক Dr. Thomas Munro যে মন্তব্য করেছিলেন, তা এখনে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

"A thorough and original scholar in aesthetics, Dr. Chaudhuri understood to an unusual degree both the Eastern and Western contributions to this subject, as well as the broader cultural traditions from which they developed. He was therefore able, in his writings, to select and emphasize some of the best elements in both, to show some areas of agreement and common interest between them, and to suggest possible ways of future synthesis. The Journal of Aesthetics and Art Criticism was foretunate in being able to publish some of his articles,"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রবাসজীবনের মৃত্যুতে The Journal of Aesthetics and Art Criticism প্রবাসজীবনের উপরে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। উক্ত বিশেষ সংখ্যাটি প্রবাস-জীবনের কয়েকটি নন্দনতাত্ত্বিক প্রবন্ধের সংকলন রূপে—The Aesthetic Attitude in Indian Aesthetics অভিধায় প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক বুধমণ্ডলীতে—বিশেষত নন্দনতাত্ত্বিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রবাসজীবনের স্থান কোথায় ছিল, এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

প্রবাসজীবনের রচনা কেবল মননশীল বা জ্ঞানাত্মক প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও তিনি ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দী ভাষাতে কবিতা, গান, রুবাই, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন। এ থেকে আমরা তাঁর সাহিত্যপ্রীতির গভীরতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করতে পারি। বুঝতে পারি, যখন তিনি জ্ঞানচর্চায় সম্পূর্ণ একাগ্র, তখনো তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ও শিল্পপ্রীতি অলক্ষ্যে তাঁর চিন্তার গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাঁর মনোযোগকে অনেকখানি পরিমাণে শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে—এবং সাহিত্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রেখেছে। তবে এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, বিশুদ্ধ দর্শনের প্রতি আকর্ষণও তাঁর কিছুমাত্র কম ছিল না। বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণও নিতান্ত তুচ্ছ করার মতো নয়। একটা জিনিস লক্ষ করলে সহজেই বোঝা যাবে: সকল ক্ষেত্রেই প্রবাসজীবনের দৃষ্টি দার্শনিকের সমগ্র দৃষ্টি।

যন্ত্রস্থ ইংরেজি বই দুখানিকে ধরলে প্রবাসজীবনের ইংরেজি ভাষায় রচিত বইয়ের সংখ্যা চোদ্দ। বর্তমান গ্রন্থের শেষে 'পরিশিষ্ট-ক' অংশে আমরা তাঁর বইয়ের একটি তালিকা দিচ্ছি। এই তালিকা থেকে আমরা লেখক প্রবাসজীবনের আগ্রহ ও চিন্তার গতি-প্রকৃতির বিষয় সহজেই বুঝতে পারব।

আগেই বলেছি, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবাসজীবন বিজ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞানের দর্শন, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব-কাব্যতত্ত্বের বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, তার সংখ্যা কমপক্ষে দেড়শ'। এর কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ বিভিন্ন বইয়ে গৃহীত হয়েছে, অধিকাংশ প্রবন্ধ পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ আছে। আশঙ্কা করি, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলে তার কিছু কিছু প্রবন্ধ কালক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়বে। আগেই বলেছি, প্রবাস-জীবন বহু বিষয় নিয়ে লিখেছেন। তার সব এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। বর্তমান গ্রন্থের শেষে, 'পরিশিষ্ট-খ' অংশে প্রবাসজীবনের সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রধান প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা সংযোজিত হল।

প্রবাসজীবনের বাংলা প্রবন্ধের সংখ্যা ইংরেজির তুলনায় কম, সংখ্যা সাতাশের মতো হবে। ইংরেজি প্রবন্ধ একশ'র অনেক বেশি। সৃজনশীল রচনার—অর্থাৎ গান কবিতা গল্প—ইত্যাদির কথা হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

প্রবন্ধের প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষ করার মতো। সাহিত্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের তুলনায় নন্দনতত্ত্ব বা শিল্পদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক বেশি। বইয়ের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যা-কিছু রচনা, তার অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে। তাঁর রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত ইংরেজি গ্রন্থ "Tagore on Literature and Aesthetics' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক বই হলেও নন্দনতত্ত্ব সেখানেও অনুপস্থিত নয়। তাঁর বাংলা বই 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন' সম্পর্কেও সেই একই কথা। এটিও মূলত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। কিন্তু এখানেও নন্দনতত্ত্ব অনুপস্থিত নয়। বইয়ের নামে যে সৌন্দর্য-দর্শন কথাটি পাচ্ছি, তা নন্দনতত্ত্বেরই সমার্থক শব্দ হিসেবে গৃহীত। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন বাদ দিলে কী ইংরেজিতে কী বাংলায় সরাসরি সাহিত্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে প্রবাসজীবনের কোনো বই অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি। ('রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আদর্শ' সাহিত্যতত্ত্বের বই, কিন্তু তার অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ।) অনুমান করি, নিজে কবি হওয়া

সত্ত্বেও এবং প্রবল সাহিত্যপ্রীতি সত্ত্বেও, স্বভাবের প্রবলতর দার্শনিক প্রবণতাই প্রবাসজীবনকে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্য-দর্শনের দিকে সমধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করেছে। করেছে এই কারণে যে, মূল দার্শনিক ভূমিটি নন্দনতত্ত্বেরই, সাহিত্যতত্ত্ব-কাব্যতত্ত্ব খানিকটা তার শাখার মতো—কাব্য হোক, নাটক হোক আর যে-কোনো শিল্পই হোক, মৌল তত্ত্বগুলির বিচারের অবকাশ নন্দনতত্ত্বেই বেশি।

বর্তমান বইটি ('কাব্যমীমাংসা') প্রবাসজীবনের সরাসরি কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক রচনা, যদিও এতে নন্দনতত্ত্ব সম্পূর্ণ অবহেলিত হয় নি। সে দিক থেকে এ বইটির একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। দর্শনে আগ্রহ থাক আর না-ই থাক্, দর্শনে অধিকার নেই এমন পাঠক-পাঠিকা বা ছাত্র ছাত্রীর— অথবা এমন সাহিত্য-প্রেমিক কাব্য-প্রেমিকের সংখ্যা কম নয়। এই সব কাব্য-কুতূহলী ও কাব্য-প্রেমিক পাঠক-পাঠিকা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এ বইটির প্রকাশ নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

৩. গ্রন্থপরিচয়

প্রবাসজীবনের বর্তমান বইটি—'কাব্যমীমাংসা'—মূলত কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক। ইচ্ছা করলে বইটিকে আমরা সংকলন-গ্রন্থ রূপেও—কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন, এই হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। তার কারণ এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের কয়েকটিই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রূপে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, প্রথম অধ্যায়, কাব্যের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ সংখ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়, কাব্যানন্দের প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ৩৭৪ সংখ্যায়। অন্য কয়েকটি প্রবন্ধও ওই রকম পূর্বে প্রকাশিত। সম্ভবত কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে একটি ধারাবাহিক, অর্থাৎ অখণ্ড গ্রন্থপ্রকাশের পরিকল্পনা

মনে রেখেই প্রবাসজীবন বইয়ের অংশ রূপে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন। আরো প্রবন্ধ এর সঙ্গে যুক্ত হত কিনা জানি না। হয়তো তার প্রয়োজন হত না, কারণ এর মধ্যেই একটা আপেক্ষিক সমগ্রতা এসে গিয়েছে। প্রবাসজীবন নিজে বইটি দেখে যান নি। তাঁর কালের এবং পরবর্তী কালের পাঠক-পাঠিকা ছাত্রছাত্রীদের হাতে বইটি তুলে দিতে পারলে আমরা তৃপ্তি লাভ করব।

বইটির বিষয় সম্পর্কে পূর্ব-বক্তব্যের জের হিসেবে আরো একটু বলার আছে। প্রথম কথা, কাব্য কথাটি এখানে একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সূত্রে নাটকও এই আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়টি, দুঃখমূলক নাটকের সৌন্দর্য, সেই কারণেই এ বইয়ের আলোচনার বিষয় হতে পেরেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঠিক এই বিবেচনাতেই তাঁর 'পোয়েটিক্স' বইয়ের প্রায় সবটা জুড়েই এরিস্টট্‌ল ট্র্যাজেডির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হল প্রবাসজীবনের প্রবণতার টান। এখানেও ষষ্ঠ অধ্যায়, 'হাস্য কৌতুক' মূলত নন্দনতত্ত্বেরই বিষয়—কাব্যতত্ত্বে এদের প্রবেশ নিতান্তই আনুষঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে যেহেতু এখানে কাব্য কথাটাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত অর্থেই ধরা হচ্ছে, এবং যেহেতু বাস্তবতা সব শিল্পেরই অন্তরঙ্গ সমস্যা, সাহিত্যের তো বটেই, সেই হেতুই বাস্তবিকতার প্রসঙ্গকে কাব্যমীমাংসায় ন্যায্য স্থান আছে বলেই মেনে নিতে হবে।

যে-কোনো জিনিস সম্পর্কেই প্রথম প্রশ্ন, একেবারে গোড়ার প্রশ্ন বলতে পারি, সব থেকে দার্শনিক প্রশ্ন হল, জিনিসটি কী? কে তুমি? সৌন্দর্য-তত্ত্ব সাহিত্যতত্ত্বেও তাই। কাকে বলব সুন্দর, কাকে বলব সাহিত্য? কাব্যতত্ত্বের গোড়ার প্রশ্নটিও সেই একই রকম। কাব্য কি, কাকে বলব কাব্য, কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়, কোন বিশেষ গুণে কাব্য অকাব্য থেকে পৃথক্? বলা নিষ্প্রয়োজন, তাই দিয়েই কাব্যের স্বরূপলক্ষণ, তাই দিয়েই

কাব্যের সংজ্ঞা। যদি আত্মা কথাটাতে আপত্তি না থাকে তাহলে বলব, সেইখানেই কাব্যের আত্মা।

প্রবাসজীবনের বর্তমান বইটির প্রথম অধ্যায় তাই নিয়েই : কাব্যের স্বরূপ। এই প্রশ্নে প্রবাসজীবনের সিদ্ধান্ত ভারতীয় রসবাদীদের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। বস্তুত এই অধ্যায়টিকে রসবাদের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য বলে ধরা যেতে পারে।

একাধিক শক্তির একত্র সংযোগের ফলে কাব্য কাব্যত্ব পায়—ভাষার বা শব্দার্থের শক্তি, সৃজনের শক্তি, সম্ভোগের শক্তি; এমন কি সম্ভবত সমাজেরও, সংস্কৃতিরও শক্তি। তাই নানা দিক থেকে নানাভাবে কাব্যের স্বরূপকে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। কেউ ধরতে চেষ্টা করেছেন ভাষায়, অলংকার দিয়ে, বক্রোক্তি দিয়ে, অথবা ধ্বনি দিয়ে। কেউ বা বলেছেন কবির কল্পনাতেই কাব্য, কবির সৃজনেই কাব্য—কবির আত্মপ্রকাশেই কাব্য। কেউ-বা বলেছেন, সহৃদয় পাঠকের আনন্দের মধ্যেই কাব্যের কাব্যত্ব। সমাজের দিক থেকে যারা ধরতে চেয়েছেন, তাদের লক্ষ্যটা সরাসরি কাব্যের কাব্যত্ব নয়, কাব্যের উৎকর্ষ, কাব্যের উপযোগিতা।

আমরা জানি, এর মধ্যে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব মূলত কবি-কেন্দ্রিক বা স্রষ্টাকেন্দ্রিক কাব্যতত্ত্ব। পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্যতত্ত্ব এক দিক থেকে নির্মিতি-কেন্দ্রিক কাব্যতত্ত্ব, অলংকারবাদী কাব্যতত্ত্ব অন্য দিক থেকে—ভাষার দিক থেকে নির্মিতি-কেন্দ্রিক কাব্যতত্ত্ব। বক্রোক্তিবাদ ধ্বনিবাদও ভাষার দিক থেকে নির্মিতি-কেন্দ্রিক, তবে জোরটা সেখানে শব্দার্থের রহস্যের দিকে।

রসবাদী কাব্যতত্ত্ব দ্বিধাহীনভাবে ভোক্তা-কেন্দ্রিক বা সম্ভোগ—কেন্দ্রিক কাব্যতত্ত্ব। ধ্বনিবাদীদেরও শেষ পর্যন্ত এই গোত্রেই ফেলতে হয়, কেননা তাঁরা শুধু ধ্বনিবাদী নন, রসধ্বনিবাদী। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তাঁরাও রসবাদী।

প্রথম অধ্যায়ে প্রবাসজীবন যুক্তি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহযোগে এই

সম্ভোগ-কেন্দ্রিক বা আনন্দ-কেন্দ্রিক কাব্যতত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে যার সূচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে—কাব্যানন্দের প্রকৃতি শীর্ষক আলোচনায় তারই প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কেন্দ্রস্থ বক্তব্যটি অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটিতেই ধরা পড়েছে ; 'কাব্যানন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাব-প্রকাশ থেকে এর উৎপত্তি।' প্রবাসজীবন সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন, ভাবকে ভোগ করা এক ব্যাপার আর ভাবকে উপভোগ করা—ভাবটিকে মনন দিয়ে জয় করা, ভাবটিকে নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে একটি সর্বজনীন বিষয়বস্তুরূপে অবলোকন করা, এ এক সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। এ উপভোগ বা সম্ভোগ আনন্দময় এবং সে আনন্দের মূল সম্ভোগকারীর আত্মচৈতন্যে। এই অলৌকিক আনন্দেরই নাম রস।

রস এবং রসোৎপত্তির ব্যাখ্যার ধাপ ধরে ধরেই এই অধ্যায়ে প্রবাস-জীবনের রসবাদী সিদ্ধান্ত আপন পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছেছে। সেই সূত্রেই মাঝখানের একটি ধাপে তিনি সাধারণীকরণ ব্যাপারটিকে আমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রসোৎপত্তিতে বিভাবাদিব ভূমিকা কী, অপর পক্ষে ধ্বনির ভূমিকাই বা কী তারও খানিকটা ব্যাখ্যা এখানে মিলবে।

এই অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ হয়েছে রসপ্রতীতির প্রসঙ্গ দিয়ে, রসপ্রতীতির মধ্যে যে একটি নিবিড় আত্মানুভূতি আছে সেই প্রসঙ্গ দিয়ে। এর পরেই স্বতন্ত্রভাবে কাব্যে ভাবপ্রকাশের আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু তাই : ভাবপ্রকাশ।

ভাবপ্রকাশ সফল বা সার্থক হলে রসনিষ্পত্তিও সেই সঙ্গেই সিদ্ধ হয়। রসনিষ্পত্তির অপরিহার্য শর্ত কতকগুলি বিশিষ্ট উপাদানের—ভাবকে পশ্চাৎপটে রেখে, বিভাব অনুভাব এবং সঞ্চারীভাবের সংযোগ। রসনিষ্পত্তি ঘটে পাঠকচিত্তে, রসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নন, রসের আধার সহৃদয় পাঠক। কিন্তু কী উপায়ে পাঠকচিত্তে বিভাবাদির প্রতিষ্ঠা ঘটে সেইটে

অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। সেইখানেই ভাষার রহস্য, শব্দ আর অর্থের রহস্য—কবির সৃজনের রহস্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভই সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসে। প্রথম বাক্যটিতেই সেই নির্দেশ। বলেছেন, 'কাব্যে ভাবপ্রকাশের উপায় ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন-ব্যাপার।'

সমস্ত অধ্যায়টিই ধ্বনির ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় প্রবাসজীবন দৃষ্টান্ত দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন নি। আরো তৃপ্তিদায়ক যে, প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বাংলা কবিতা ও গান থেকে—বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়ের এই আলোচনায় অভিধা বা বাচ্যার্থ, লক্ষণা এবং তাৎপর্য—শব্দের এই শক্তিগুলিও স্বাভাবিকভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ ভাগে, ধ্বনি-প্রসঙ্গের প্রান্তে এসে লেখক বলেছেন যে, ব্যঞ্জনা-শক্তি বা ধ্বনি কয়েকটি ব্যাপারের উপর অনিবার্যভাবে নির্ভর করে, যেমন—প্রসঙ্গ, অথবা যেমন পাঠক বা শ্রোতার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও রসবোধ।

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি ব্যঞ্জনা অনুমানের ব্যাপাব? শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচার্থ থেকে ধ্বনি কি অনুমিত হয় কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে?

লেখক একথা একেবারেই স্বীকার বরেন না। ব্যঞ্জনা অনুমানের ব্যাপার নয়। লেখক দেখিয়েছেন, রসপ্রতীতি যেমন অব্যবহিত উদ্ভাস, ধ্বনিপ্রতীতিও তাই। লেখক মনে করেন, ভাব-ব্যঞ্জনা ও রসপ্রতীতির মধ্যে বস্তুব কোনো ছেদ কল্পনা করা যায় না। ছেদ না থাকলেও চরমতা রসেরই, অর্থাৎ পাঠকচিত্তের আনন্দই কাব্যের শেষ কথা। প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করেছেন প্রবাসজীবন সেই বথা বলেই: 'রসই কাব্যের অন্তরতম তত্ত্ব।'

বিশিষ্ট অর্থে আজ যাকে আমরা কাব্য বলি, সেই কাব্যবিষয়ের মূল তত্ত্ব এই প্রথম তিন অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। মীমাংসার কেন্দ্রে কাব্যের সমস্যাকে রাখলেও লেখক কিন্তু এখানে কাব্যকে সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। সেই কারণেই তাঁর মীমাংসা সাহিত্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমস্যাকেও স্পর্শ করেছে। নাট্যশাস্ত্রীদের কথা বাদ দিলে, প্রাচ্য

অলংকারশাস্ত্রীরা সাধারণত তাঁদের আলোচনাকে বিশিষ্ট অর্থে কাব্যের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। এ দিক থেকে পাশ্চাত্য আলোচনায় ব্যাপকতা অনেক বেশি। এরিস্টটল্‌ তাঁর কাব্যতত্ত্বের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুস্তিকাতে ট্র্যাজেডি; কমেডি, এপিক নানা বিষয়ের কথাই বলেছেন। বরং তথাকথিত 'কবিতা' বা লিরিকের কথাই তিনি প্রায় বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

ধ্বনিবাদীদের প্রায় পুরো আলোচনাটাই লিরিককে নিয়ে। লিরিক সংক্রান্ত আলোচনার অগ্রাধিকার স্বীকার করেও প্রবাসজীবন তাঁর আলোচনাকে ট্র্যাজেডি বা দুঃখমূলক নাটক, বাস্তবতার সমস্যা, প্রভৃতি সাহিত্যতত্ত্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অভিমুখে চালিত করেছেন। দুঃখমূলক সাহিত্য, সাহিত্যে বাস্তবতা, সাহিত্য ও সমাজ এর প্রত্যেকটিই সাহিত্যতত্ত্বের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সংযোজনের তিনটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে ভারতীয় সৌন্দর্যদর্শন বিষয়ে এবং তৃতীয়টিতে শিল্পের সামাজিক মূল্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে সংযোজনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প-পরিসরে কোনো কোনো ক্ষেত্রেই বিষয়ের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। প্রবাসজীবন তেমন দাবিও করেন নি। তাই শুধু বিষয়ের কেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেই থেমে গিয়েছেন। এতে যদি কোনো পাঠকের অতৃপ্তি থেকে যায়, কিছু করার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, ছোট পরিসরে যতটুকু প্রত্যাশিত তা আমরা লেখকের কাছ থেকে পেয়েছি।

এই বই সম্পাদনার কাজে স্বর্গত ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরীর সহধর্মিণী শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরীর কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডঃ প্রণবকুমার সেনের কাছ থেকেও মূল্যবান সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানানো নিষ্প্রয়োজন।

—সত্যেন্দ্রনাথ রায়

প্রথম অধ্যায় :

॥ কাব্যের স্বরূপ ॥

একটি বিশেষ প্রকারের আনন্দদান করাই কাব্যের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম। এই সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, এই আনন্দদান যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে এবং যে মানসব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয় তারাও কাব্যের স্বরূপ-নির্ণয়ে বা লক্ষণ-বিচারে বিবেচিত হয়। আনন্দদানই কাব্যের সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয়। কারণ আনন্দলাভ আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। কোন মনুষ্যনির্মিত বস্তুর উদ্দেশ্য কি তাও আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য। যেহেতু কাব্যের এই আনন্দসৃষ্টিকারিতা সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে সেহেতু এই গুনটির দ্বারাই আমাদের কাছে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপিত। অবশ্য কাব্যের এই প্রাথমিক সংজ্ঞাটি—যা এখন বীজ আকারে আছে, ক্রমে ক্রমে তা মূল শাখা-প্রশাখা-পল্লবে প্রসারিত হবে। কারণ এই সংজ্ঞাটির সংজ্ঞা—আবার তার সংজ্ঞা—এইভাবে অনেক তত্ত্বের সারিতে টান পড়বে যেই আমরা কাব্যকে বিশদরূপে জানতে অগ্রসর হব। বিশেষ ধরনের আনন্দদান যা কাব্যের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম বলা হয় তারও স্বরূপ এবং লক্ষণ নির্ণয় করতে হবে এবং সেগুলির গুণধর্মও বিচার করতে হবে। তা না হলে যদি বলা হয় যে, কাব্য তাই যা একটি বিশেষ ধরনের আনন্দ দেয় এবং সেই বিশেষ ধরনের আনন্দ সেই বস্তু যা কাব্য হতেই পাওয়া যায় তা হলে স্পষ্টই দেখা যায় শব্দের আবর্তেই শুধু ঘোরা হয়, বাস্তবিক কোনো জ্ঞান হয় না। ক্যাবের যা বৈশিষ্ট্য তার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এই ব্যাখার বা সংজ্ঞা-নিরূপন ব্যাপারের শেষ ধারণাগুলি আমাদের জ্ঞান-সাপেক্ষ ও সার্বিক হতে পারে। তা না হলে আমাদের কাব্য-মীমংসায় পেঁাছানো সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কথা ।। প্রথমেই কাব্যের আনন্দকে সাধারণ আনন্দ হতে পৃথক বলে জানতে হবে। নয়তো কাব্যের সঙ্গে সাধারণ আমোদ-প্রমোদ বা ক্রিয়া-কলাপের কোনো প্রভেদ থাকে না । ওয়ার্ডসওয়ার্থ[1] এবং কোলরিজ[2] কাব্যের আনন্দ দিয়েই তার লক্ষণ বিচার করেছেন। কিন্তু তারা কাব্যের আনন্দকে অন্যান্য আনন্দ হতে পৃথক করে দেখেন নি বা দেখান নি এবং সেইজন্যই দুই রকমের সমালোচনার হাতও এড়াতে পারেন নি । প্রথমতঃ যেমন টলস্টয়ের মতে কাব্যের কাজ যদি আনন্দদানই হয় তবে তাকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে কোনো গৌরবের বস্তু বলে মনে হবে না । তা ছাড়া কাব্য এমন কি করে, যার জন্য সে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে ? ব্যসন হতেও তো আমরা আনন্দলাভ করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, দুঃখমূলক নাটক ও ট্র্যাজেডি যে ধরনের আনন্দ আমাদের দেয় তাকে তো সাধারণ অর্থে আনন্দ বলা যায় না। কেননা তা হলে বলতে হয় যে আমরা যখন নায়কের দুঃখে অশ্রুবিগলিত হই তখন আমরা মিথ্যাচার করি ; আসলে আমরা আমোদই পাই এবং পরের দুঃখে আমোদ পাওয়াটা আমাদের স্বভাব। কিংবা বলতে হয়, যে-ট্র্যাজেডি হতে কোনো আনন্দই পাওয়া যায় না তা কাব্য নয়। অতঃপর এই বিপর্যয় নিবারণ করবার জন্য অ্যারিস্টটল[3] বললেন যে, ট্র্যাজেডির একটি বিশেষ আনন্দ (proper pleasure) আছে। যদিও অ্যারিস্টটল এই বিশেষ আনন্দটির ব্যাখ্যা করেন নি। কান্টও

1. "The end of poetry is to produce excitement in co-existence with an overbalance of pleasure"—Wordsworth : *Preface to Lyrical Ballads, 1800.*

2. "It is that species of composition which is opposed to science by proposing for itself its immediate object pleasure, not truth." Coleridge : On *Poesy or Art.* (1818) in Biographia Literaria (Oxford. 1907)। তেমনই "Dryden বলেন : "Delight is the chief aim." *Essay on Dramatic Poesy* (1668) আরও অনেকে যেমন Horace Philip Sidney বলেন : শিক্ষা ও আনন্দ-দান উভয়ই কাব্যের উদ্দেশ্য । কিন্তু এখানেও কাব্যের আনন্দঘন অংশটুকুর বৈশিষ্ট্য বলা হল না—অধিকন্তু মনে রাখতে হবে যে কাব্যনীতি শিক্ষার বাহন নয়।

3, Bywater এর অনুবাদ, *Aristotle on the Art of Poetry* (1920) pp, 52 79, 95

এক বিশেষ ধরনের আনন্দ দ্বারা শিল্পের লক্ষণ-নির্দেশ করেছেন—সে আনন্দ ইন্দ্রিয়জনিত সুখ, জ্ঞানভিত্তিক বা নীতিমূলক আনন্দ হতে বিলক্ষণ। সুতরাং কাব্যের আনন্দের প্রকৃতি একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লংগাইনাস[4] এক মহান তুরীয়ানন্দরূপে দেখেছেন এবং অভিনবগুপ্ত[5] এ আনন্দকে 'অলৌকিক-চমৎকার' বলেছেন, আর মম্মট[6] এ আনন্দকে বলেছেন 'সদ্যপরানিবৃত্তিঃ'। কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যসম্ভোগ যে মানসক্ষেত্রে সম্ভব হয় তা সাধারণ নয় বলেই ভারতীয় আলংকারিকগণ মনে করেন। চিত্তের এই উচ্চস্তরে সাধারণ স্বার্থ-বুদ্ধি এবং কামনা-বাসনা লোপ পায় ও কবি বা কাব্যরসিক কাব্যবর্ণিত ভাবাদি দ্বারা অভিভূত না হয়ে তাদের সম্যক্ উপলব্ধি করেন এবং ঐ সঙ্গে আপনার নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্য স্বরূপকেও উপলব্ধি করেন। তার এই আত্মোপলব্ধির সঙ্গে জড়িত হয় একটি অলৌকিক আনন্দ - যাকে 'পরাব্রহ্মাস্বাদ সচিব'[7] বা 'ব্রহ্মাস্বাদ' সহোদরা[8] বলা হয়েছে— কারণ এই মুক্ত স্বভাব আত্মা ভাবাদি দ্বারা চালিত না হয়ে তাদের কেবল মনন করে তৃপ্ত হয়। অতঃপর আমরা দেখি যে কাব্যের স্বরূপকে ভারতীয় কাব্য-দর্শনে 'রস' সংজ্ঞা-দ্বারা বোঝানো হয়েছে[9] এবং এই রসকে নিজের সম্বিতের আস্বাদ বলা হয়েছে—যে সম্বিতের উপর কাব্যে বর্ণিত ও চিত্তে জাগরিত ভাবগুলি চিত্রিত হয়ে থাকে।[10] আনন্দঘন আত্মার আস্বাদ বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক হবারই কথা এবং কাব্যের ভাবাদি সেই বিশিষ্ট অলৌকিক

4. Longinus on the Sublime অনুবাদক Saintsbury। তাঁর *Loci Critici* দ্রষ্টব্য।

5. ধ্বন্যালোকলোচন ৩/৩৩ঃ অভিনবগুপ্ত-রচিত। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের ভাষ্য।

6. কাব্যপ্রকাশ ৪।২৭-২৮

7. ধ্বন্যালোকলোচন ২।৪

8. সাহিত্য-দর্পন ঃ বিশ্বনাথ-রচিত ৩।২৫

9 ভরত ঃ নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৪
অভিনবগুপ্ত ঃ ধ্বন্যালোকলোচন ১।৪, ২।৩
সাহিত্য-দর্পন ১।৩ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"

10. নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৫। সাহিত্য-দর্পন ৩।৩৫

আনন্দকে 'চিত্রতাকরণ' করে মাত্র, অর্থাৎ তার বৈচিত্র্য সম্পাদন করে।[11]

তৃতীয় কথা ।। এই আনন্দ-দ্বারা কাব্যকে মানুষের অন্যান্য অনেক রচনাকার্য হতে পৃথক করা সম্ভব : যথা, তার কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞান হতে। কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আনন্দই রচনার প্রত্যক্ষ ও প্রধান লক্ষ্য নয়—বরং মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধিই সেই লক্ষ্য। কিন্তু কাব্যকে অন্যান্য ললিতকলা হতে কোন্ লক্ষণ দ্বারা পৃথক করা যায়? সেসব ক্ষেত্রেও অলৌকিক আনন্দ-প্রদানই প্রত্যক্ষ ও প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে বলা যায় যে, কাব্যের মাধ্যম বা আধার ভাষা----অন্যান্য ললিতকলার তা নয়। সংগীতে ভাষার প্রয়োগ হয়, কিন্তু তার নিজস্ব ও প্রধান মাধ্যম ধ্বনি ও তার স্বর তাল লয় ইত্যাদি। চিত্র ও নৃত্যকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম। এইসব বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে এইসকল শিল্পকলা মানবহৃদয়ের নানা ভাব প্রকাশ করে এবং সেগুলিকে রসিক-চিত্তে এমন ভাবে সংক্রামিত করে যে তাদের এইসব ভাবের রসানুভূতি হয়, যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং অনুরূপ আনন্দেরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু কাব্যকে সাহিত্যকলার অপর কয়েকটি শাখা হতে কোন্ লক্ষণ দ্বারা প্রভেদ করা যায়? তারাও তো ভাষার মাধ্যমেই অলৌকিক আনন্দ-প্রদান করে। এখানে কি ছন্দমিল-আদির সাহায্যে কাব্যকে নাটক উপন্যাস গল্প ও রম্যরচনা হতে পৃথক করব? কিন্তু, যেমন শেলী বলেছেন—[12] এইরকম ভেদ মনে করা অযৌক্তিক ও স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক। কারণ কাব্য তো গদ্যেও লেখা হয়ে থাকে এবং কাব্যমাত্রকেই যে ছন্দমিলের আশ্রয় নিতে হবে এমন কথা আজকের কবিরা তো মানবেনই না। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে এমন-একটি রচনাকে কাব্য বলব যার ভাবসম্পদ খুব ঘন এবং সেইজন্য সেটি আবেগপ্রধান। এইজন্য কাব্যের ভাষা পদ্য হতে চায়, কারণ তা ভাব-প্রকাশের তাগিদে সংগীতের

11. অভিনব- ভারতী ৬।৩৫ (অভিনবগুপ্ত রচিত ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য)।

12. "The distinction between poets and prose writers is a vulgar error" *Defence of Poetry*, 1821

সাহায্য নিতে চায়। শব্দের কেবল অর্থ-জ্ঞাপকের কাজটিতে কবি সন্তুষ্ট নন, তিনি শব্দের ধ্বনিরও সাহায্য নেন তাঁর ভাবপ্রকাশের কাজে। তাই বিষয়-অনুসারে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টি ক'রে শব্দচয়নে শব্দের ধ্বনির দিকে কান রাখেন। কেবল অর্থের দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের— 'ভোরের প্রথম আলো, জলের ওপারে' বা 'তরুণী রজনীগন্ধা, উন্নমিতা. একান্ত কৌতুকী'—এমন কোনো গভীর ভাবাবেগ জাগায় না। কিন্তু এই পংক্তি দুটি পাঠ বা শ্রবণ করলে চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে এক অব্যক্ত সুষমায়। এইজন্য কাব্যের অনুবাদ অসম্ভব।

চতুর্থ কথা ।। কাব্যের এই বিশিষ্ট আনন্দরসটি দিয়েই কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে হবে—সৌন্দর্য দিয়ে নয়। সৌন্দর্য সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা চাই। সুন্দর বলতে অনেক কথাই আমাদের চিন্তায় উপস্থিত হয়। কাব্য সুন্দরকে প্রকাশ করে এ কথা বললে সাধারণতঃ মনে হবে কাব্যে রমণীয় বস্তুরই প্রতিফলন হয় এবং তা মনোহরণ করে—যেমন মনোহরণ করে কোনো অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা বা রূপবতী নারী। কিন্তু মনোহারিতা বা রমণীয়তাই কাব্যের লক্ষণ হতে পারে না, কারণ কাব্যে মানবহৃদয়ের নানান ভাবের রূপায়ণ হয় এবং ভয়ংকর ও বীভৎস রসেরও কাব্য হয়। সুতরাং কাব্যকে যদি সৌন্দর্যের ধারণা দিয়ে পরিচয় দিতে হয় তা হলে সৌন্দর্যের সাধারণ ধারণাটিকে একটু বদলে নিতে হবে। যথার্থ সৌন্দর্য-বোধ তখনই ঘটে যখন আমরা যে-কোনো ভাবকে—তা আপাতরমণীয় হোক বা না-হোক--নিবিড় অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করি এবং তার গভীর সত্যটিকে জানি। কারণ, এই প্রকারে কোনো ভাবকে জানার সময়ে চৈতন্যপুরুষ নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব ধারণ করে অর্থাৎ তখন সে তার সাধারণ জীব-জগতের নানান বিক্ষেপ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেই সচেতন হয়। এই আত্মোপলব্ধি যখন হয় তখনই হয় রসানুভূতি, এবং একেই যদি সৌন্দর্যানুভূতি বলা যায় তা হলে সেই অর্থে কাব্য সৌন্দর্যকে প্রকাশ বা রূপায়ণ করে। রবীন্দ্রনাথও সৌন্দর্যের প্রচলিত অর্থে কাব্যের আনন্দকে

গ্রহণ করেন নি বরং এইরূপ এক পরিবর্তিত অর্থে সৌন্দর্য তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল [13]। যেহেতু সৌন্দর্যের এই উন্নত সংজ্ঞা চলিত নয় সেজন্য সাধারণতঃ এই ধারণাটি কাব্যের সংজ্ঞা-নিরূপনে ব্যবহৃত হয় না। ভারতীয় কাব্যদার্শনিকগণও তা করেন নি। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও বড়ো একটা করেন নি।

আনন্দের সংজ্ঞাটির বেলায় এরকম সংকটের সম্মুখীন হতে হয় না; কারণ আনন্দের যে স্তরভেদ আছে তা সকলের বিদিত এবং কাব্যানুশীলনের আনন্দ যে জাগতিক ক্রিয়াকর্মের লৌকিক আনন্দ হতে ভিন্ন তা প্রায় সকল কাব্যামোদীই অনুভব করেন।

পঞ্চম কথা ।। কাব্যের এই বিশিষ্ট এবং অলৌকিক আনন্দ লৌকিক-আনন্দ থেকে পৃথক বস্তু, তেমনই আমার তা জ্ঞানের আনন্দ (যা বিজ্ঞান ও দর্শন অনুশীলনে লাভ হয়) হতেও ভিন্ন প্রকারের। এ কথাও সত্য যে কোনো কাব্যে বিশুদ্ধ কাব্যিক আনন্দের সঙ্গে এই দুই প্রকার আনন্দও অল্পবিস্তর মিশ্রিত থাকে। তবুও কাব্যের কাব্যত্ব তার বিশিষ্ট আনন্দদানের শক্তি-সামর্থ্যেই। আবার এও দেখা যায় যে, কাব্যকে লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নামানো হয় এবং এর দ্বারা জনশিক্ষা বা অন্যান্য উপকারিতা কথাও বলা হয়। আজকাল ললিত ও ফলিত কলার পরিপাটি পৃথকীকরণকে অনেকেই সুনজরে দেখেন না, যেমন দেখেন নি আনা তোল ফ্রাঁস ও জন ডিউই। কারণ ফলিত কলা বা কারুশিল্পের মধ্যেও নিরাসক্ত মনের অবকাশ থাকে, শুধু প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদ ও তৃপ্তি নয় এবং সকল ললিতকলা চারুশিল্পেরও কিছু কিছু উপযোগিতা থাকে। অন্ততঃ তা থাকা স্বাভাবিক ও উচিতও বটে। কবি বা শিল্পী মানুষকে কেবল বিশুদ্ধ মননের বিষয়বস্তু উপহার দেন না, ঐ সঙ্গে তাকে কিছু বলেন বা শিক্ষা দেন। কাব্যের বা ললিতকলার মধ্যে কিছু নিহিত বাণী থাকে, সে বাণী এ নয় যে শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যই মানুষের একমাত্র কাম্য (যা কবি কীট্স বলেছিলেন) বরং এমন-কিছু যা মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে বাস্তবিক সাহায্য

13. দ্রষ্টব্য সাহিত্যের পথে।

করে। অবশ্য এই বাণীটি সরাসরিভাবে কাব্যকলায় পাওয়া যায় না, আভাসে ইঙ্গিতেই হয় তার প্রকাশ এবং রসবোধের অন্তর্গত হয়েই সে মানুষের কাছে আসে। এ কথা স্বীকার করেও বলা যায় কাব্যের কাব্যত্ব তার বিশুদ্ধ রস-পরিবেশনে এবং যেখানে এইরূপ ব্যবহারিক কিংবা বুদ্ধিমূলক কিংবা নীতি-ধর্মানুপ্রাণিত মূল্যবোধ কাব্যের কাব্যিক মূল্যবোধকে অপ্রধান করে দেয়, সেখানে কাব্য আর কাব্য থাকে না। কাব্যের ব্যবহারিক মনোভাবের এবং জ্ঞান নীতি ও ধর্মের প্রেরণার দৃষ্টান্ত যেমন অজস্র তেমনই আবার এই ভাবগুলির আধিক্যে কাব্যের রসভঙ্গ এবং অধঃপতনের দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

ষষ্ঠ কথা।। কাব্যের স্বরূপনির্ণয়ে অনেকে কাব্যের শব্দপ্রয়োগ-কৌশলকে আশ্রয় করেছেন। ধ্বনিবাদীরা—যেমন ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন[14] মনে করেন যে শব্দ এমন রূপে কাব্যে প্রয়োগ করা হয় যে তাদের বাচ্যার্থের মধ্য দিয়ে এবং তাকে ছাড়িয়ে একটি ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশিত হয়, যা কাব্যের প্রধান অর্থ হয়ে চিত্তকে একটি চমৎকারিতার আস্বাদ দেয়। শরীরের লাবণ্য যেমন শরীরের অবয়ব দ্বারাই প্রকাশিত হয়েও তা শরীরকে অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র ভাববস্তু রূপে প্রতিভাত হয়—কাব্যের ধ্বনিকে সেই ভাবেই বুঝতে হবে। এখন এই চমৎকারিত্বের মূলে আছে শব্দের এইরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি, বিশুদ্ধ ধ্বনিবাদ তাই বলে। কিন্তু আনন্দবর্ধন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ধ্বনিত অর্থ তিন প্রকার—বস্তুমাত্র, অলংকার এবং রসদি—এদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ—কাব্যের পরমার্থ[15]। এখন কাব্যের এই ভালোমন্দের বিচার যদি কেবল ধ্বনির ভালোমন্দের বিচারে না হয়ে অন্য কিছুর সাহায্যে হয় তা হলেই ধ্বনিকে আর 'কাব্যের আত্মা' বলা যায় না। সুতরাং ধ্বনিকার তাঁর 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরীতি' সূত্রের যথার্থ মূল্য দেন নি। বাস্তবিক বিচারেও দেখা যায় যে যদিও ভাবকে রসে উন্নীত করতে হলে

---

14. ধ্বন্যালোক ১।১-৬
15. ধ্বন্যালোক ১।৪-৫

—অর্থাৎ কাব্যানন্দের উপযোগীরূপে প্রকাশ করতে হলে—শব্দের বাচ্যার্থের চেয়ে তাদের ব্যঞ্জনার্থেরই বেশি সাহায্য নিতে হয় তবুও এই রসই সেই কাব্যানন্দের স্বরূপ ; শব্দের ব্যঞ্জনা ব্যাপারটি নয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপার একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেয় বটে তা কাব্যানন্দের সমগোত্রীয় হয় না এবং এই আনন্দ অনেক রচনায় থাকলেও তা যথার্থ কাব্য বলে বিবেচিত হয় না বরং কেবল শব্দপ্রয়োগের কৌশল হিসাবেই প্রশংসা লাভ করে থাকে। যেখানে কোনো ভাবের প্রকাশ মুখ্য নয়—বরং কোনো বক্তব্য বিষয়, সংবাদ বা আদেশ প্রদানই মুখ্য—সেখানে রচনা কাব্যপদবাচ্য নয়। উদাহরণতঃ একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায় যার বাচ্যার্থ হল ঃ 'হে তপস্বি ! তুমি এখন নির্ভয়ে যেখানে সেখানে যাইতে পারো · এখানে যে কুকুরটি ছিল তাহাকে গোদাবরীতটবাসী সিংহ বধ করিয়াছে।' এর ব্যঙ্গ্যার্থ হল ঃ 'হে তপস্বি ! তোমার এখন যেখানে সেখানে যাওয়া মানে সিংহের কবলে পড়া।' শ্লোকটি কাব্যস্তরে উঠতে পারে না, তবে একটি কৌশলী বক্রোক্তিরূপে আমাদের আমোদ দেয়। কাব্য আমোদ বা কলাকৌশলের ব্যাপার নয়, বরং গভীর অনুভূতিও রসোপলব্ধির বস্তু—যার দ্বারা রসিক-চিত্ত ভাবের সত্য-রূপটিকে এবং সেই সঙ্গে আপন চৈতন্য স্বরূপকে আস্বাদ করে। গভীর রসসৃষ্টি সম্ভব হয় শব্দের ধ্বনির মাধ্যমেই। কারণ কোনো ভাবকে পরিস্ফুট করতে হলে শুধু তার উল্লেখে কোনো কাজ হয় না, তাকে তার অন্তর্গত সঞ্চারীভাব ও উপযুক্ত বিভাব এবং অনুভাব সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে এবং এখানে শব্দার্থ দ্বারা কেবল সেই সকল বস্তু ও ভাবগুলিরই প্রকাশ সম্ভব—যারা কাব্যের সেই মুখ্য বা স্থায়ী ভাবটিকে জাগরিত করে এবং প্রাণপূর্ণ করে তোলে। যথা, শৃঙ্গার রসের বেলায় শব্দার্থ দ্বারা কোনো নায়ক বা নায়িকার সাধ-বাসনা আশা-নিরাশা হর্ষ-বিষাদ আকাঙ্ক্ষা-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবগুলিকে প্রকাশ করা যায়—কিছু এগুলির নাম নিয়ে আর কিছু স্থান কাল ও নায়ক-নায়িকার পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের হাব-ভাব হাস্য-লাস্য ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়ে যা ঐ ভাবগুলিরই দ্যোতক। সুতরাং শব্দের ধ্বনি

রসসৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাই বলে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বললে ভুল হয়, কারণ রসই কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনি তার কায়ামাত্র। ধ্বনি যদি রসসৃষ্টির উপায় না হয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তা হলে সে রচনা কাব্য হয় না—কুশল রচনার নির্দশন হিসেবেই গণ্য হয়।

ধ্বনিবাদীদের মতো রীতিবাদীরা রীতিকে, অলংকারিকেরা কাব্যালংকারকে ও বক্রোক্তিবাদীরা বক্রোক্তিকে বা কাব্য-বিন্যাসের কৌশলকে কাব্যের আত্মা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এখানেও এ কথা বলেই এদের মতবাদ খন্ডন করা যায় যে, এঁদের নিরূপিত লক্ষণগুলি অব্যাপ্তি-দোষে 'দুষ্ট'; কারণ কোনো রচনারীতি অলংকার বা বক্রোক্তির অভাবেও উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে এবং ওগুলি কাব্যের অপরিহার্য উপাদান নয়। রসই কাব্যের আত্মা এবং সেই রসে ঔচিত্য-অনুসারে কবি কাব্যে উপযুক্ত রীতি, বক্রোক্তি ও অলংকার প্রয়োগ করেন। এগুলি সেই রসের সুষ্ঠু প্রকাশের উপায়। রসই নিজেকে কাব্যে প্রস্ফুটিত করার জন্য এই-সকল উপায় সৃজন করে এবং এদের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে। রসের তাগিদে কাব্যের অন্তরাত্মা হতে না এলে এরা সব বহিরঙ্গ-হিসাবে কাব্যশরীরে ভাবস্বরূপ লেগে থাকে—কাব্যের অন্তর্গত হয়ে সুন্দরী নারীর শোভন সজ্জা ও ভূষণের মতো তার রূপ-লাবণ্যকে প্রকাশ করে না। সুতরাং দেখা যায় যে কাব্যধর্মে এই-সকল ব্যাপারকে কাব্যাত্মা রসের অধীন ও উপায়—হিসাবেই দেখা উচিত—স্বতন্ত্র ভাবে নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাব্যানন্দের প্রকৃতি

কাব্যানন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাব-প্রকাশ থেকে এর উৎপত্তি। এই সম্পর্কে প্রথম কথা—কাব্যের স্বরূপ বুঝতে হলে কাব্য হতে সৃষ্ট বিশেষ ধরনের আনন্দটিকে প্রথমে চিনতে হবে। এই আনন্দের প্রকৃতিটি জানতে হলে তার উৎপত্তি বা উৎসের রূপটিকে জানতে হবে। মানচিত্তর যে-কোনো ভাবের ভাষাগত প্রকাশ হলেই কাব্য ও তার বিশেষ ধরনের আনন্দটিব সৃষ্টি হয়। এই ভাব বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং এর প্রকাশের সঠিক অর্থটিই বা কি তার বিশদ বিশ্লেষণ ক্রমান্বয়ে পরিচিত হবে এবং এইভাবে কাব্য-মীমাংসার অন্তর্গত বহু বিচিত্র তত্ত্বের বা গূঢ় সংজ্ঞার যথার্থ ও ক্রমিক ব্যাখ্যা—অর্থাৎ সাধারণের বোধগম্য ধারণার সাহায্যে বা মাধ্যকে "অনুবাদ" সার্থক হলেই কাব্যের স্বরূপটি পরিস্ফুট হবে। কাব্যের স্বরূপটি প্রস্ফুটিত করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। কাব্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'আনন্দ' 'ভাব' 'প্রকাশ প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক অর্থ আছে এবং এগুলির ক্রমিক ব্যাখ্যা অপরিহার্য। কিন্তু এগুলির সাধারণ অর্থ গ্রহণ করলেও আপাততঃ কাজ চলে যাবে। মানচিত্তে যখন কোনো ভাবের আলোড়ন উপস্থিত হয় তখন তার উভয়বিধ পরিণতি হয়। প্রথমত :—মানুষ ঐ ভাবটি ভোগ করে—যেমন সে ভীত বা শোকার্ত হয় আর এমন-কিছু করতে উদ্যত হয় যাতে সে ঐ ভাবটি হতে নিষ্কৃতি পায়। যদি ভাবটি শোক বা ভয়ের মতো দুঃখকর না হয় বরং কামনা-বাসনা-সংশ্লিষ্ট

1. অভিনব ভারতী।

কোনো সুখকর ভাব হয় এবং সেই ভাবটির যথোপযোগী পরিপোষণ হয় —তবে সেই ভাবটি লৌকিক ক্রিয়ারূপেই প্রকাশ পায়। ভাব এখানে সীমিত ও ব্যক্তিগত মানস-ব্যাপার এবং ভোক্তার চিত্তকে অভিভূত করে।

দ্বিতীয়তঃ—মানুষ ভাবকে ভোগ করার বদলে তাকে উপভোগ করতে পারে। তখন অবশ্য সে ভাবটিকে ঠিক লৌকিক ও বাস্তবিক-রূপে পায় না এবং তার দ্বারা চালিত বা অভিভূত হয় না। সে তখন ভাবটির মর্ম জানতে পারে এবং তাকে নৈর্ব্যক্তিকাবে একটি সর্বজনীন বিষয়বস্তুরূপে অবলোকন আলোচন অথবা মনন করে। সে তখন ভাবটিকে মনন দিয়ে জয় করে—তার দ্বারা নিজে বিজিত হয় না—এবং তখনই মানুষ সেই ভাবটির অজস্র রসধারায় অবগাহন করে এবং তার পূর্ণ স্বরূপটি জানতে পারে। তখন সে ভাবটি সম্পর্কে কিছু বলতেও পারে অর্থাৎ তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। আবার তা না পারলেও 'ভাব তার কাছে এমন উপভোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে যে সে ভাবটি দুঃখকর বা বেদনাঘন হলেও ভাবের প্রাণ 'আনন্দবিন্দু-রসসিন্ধু' সে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই আনন্দ বা রসের কারণ চিত্তের সক্রিয় ও স্বচ্ছ অবস্থা—তার জ্ঞানধর্মের প্রকাশ অভিব্যক্তি বা চরিতার্থতা। ভাবের লৌকিক সুখ অথবা দুঃখ হতে তার এই আনন্দ-ধর্মিতা পৃথক করতে হয়। এই আনন্দ'কে 'রস' নামে অভিহিত করা হয় এবং আনন্দকে 'অলৌকিক' লোকোত্তর' ও 'চমৎকার' বলা হয়।[1] এই আনন্দের মূল কারণ আপনারই চৈতন্যস্বরূপ—যা এই ভাবালোচনার সময় তার মূল সাত্ত্বিক রূপটি গ্রহণ করে যা একাধারে অখন্ড, স্থির, নৈর্ব্যক্তিক, জ্ঞানধর্মী ও আনন্দঘন। সাধারণতঃ আমাদের চৈতন্য খন্ডিত ও লৌকিক স্বার্থবোধ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে—কিন্তু রসাস্বাদনের সময় আমাদের এই সাধারণ ব্যবহারিক পরিচ্ছন্ন সত্তার সাময়িক অবসান ঘটে এবং আমাদের বিজ্ঞানঘন আনন্দময় চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন আত্ম-পরের জ্ঞান থাকে না এবং সমস্ত অন্তর একটি অপূর্ব স্ববিশ্রান্ত আনন্দানুভূতির মধ্যে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। যে ভাবটি এই অলৌকিক আনন্দের নিমিত্ত হয়—তা এই

আনন্দানুভূতিকে চিত্রীকৃত বা অনুরঞ্জিত করে। সুতরাং যদিও রস মূলতঃ এক, কারণ তা হল আমাদের চৈতন্যের আনন্দমাত্র এবং এই চৈতন্য আমাদের সকলের মধ্যে একভাবে বিরাজ করে—তবু বিভিন্ন ভাবের দ্বারা চিত্রিত হয়ে এই রস-রূপই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। তাই শৃঙ্গার করুণ বীর প্রভৃতি রস রতি শোক উৎসাহ প্রভৃতি ভাবদ্বারা উৎপন্ন বলেই সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়।[2] এই মতবাদের পৃষ্ঠভূমিরূপে যে অধ্যাত্ম-দর্শন উহ্য রয়েছে তার বর্ণনা পরে আছে।

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা আমাদের লৌকিক ভাবগুলিকে রসে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হই না। আমরা আমাদের ব্যবহারিক সত্তাকে অতিক্রম করে একটি নির্বিশেষ সার্বিক সত্তায় উত্তীর্ণ হতে পারি না। জগৎকে রসের দৃষ্টিতে দেখে তার সকল ভাবকে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে অবলোকন করা সহজসাধ্য নয়। সেই নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক চিত্ত-ধর্ম সাধনাসাপেক্ষ এবং এই রসসাধনার কথা অনেক মনীষী বলেছেন। কিন্তু সে সাধনার খুব অল্প মানুষেই সাধক হতে পারেন। রসাস্বাদনের ক্ষেত্র সাধারণতঃ এই জীবন নয়—যেখানে ভাব আমাদের আরও আত্মসচেতন করে তোলে ও কর্মে প্রবৃত্ত করে। রসাস্বাদের ক্ষেত্র কাব্যকলা। কাব্যে যখন উপযুক্ত শব্দ-সংযোগে বিভিন্ন বিভাব ও অনুভাবের বর্ণনা করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে পাঠকের চিত্তে ভাবের সঞ্চার হয়—তখন সেই ভাব লৌকিক ভাবের মতো পাঠককে অভিভূত করে না বরং তা পাঠকের চৈতন্যের বিজ্ঞানাংশকেই বেশি জাগিয়ে দেয়। তখন সে সেই ভাবটিকে স্পষ্ট বুঝতে পারে এবং সেই বোধের সঙ্গেই সে নিজের বিজ্ঞানধর্মী মূল চৈতন্যটিকেও চিনতে পারে। অর্থাৎ কাব্য তার কাছে শুধু রূপে-রসে ভাবটিকেই প্রকাশ করে না—উপরন্তু তার আপন আত্মপুরুষকেও প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যায় যে, কাব্যানন্দের উৎপত্তি বা উৎস সন্ধান বা নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা যে "ভাবের প্রকাশ" কথাটি ব্যবহার করেছি এর অর্থ গূঢ় ও ব্যাপক। এই সম্বন্ধে ক্রমে

2. অভিনব ভারতী পৃ ২৮৪, ২৮১-২৯০, ধ্বন্যালোকলোচন (Chowkhamba Series পৃ. ৫১, ৮১)

বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হবে। তবে এখানে এ কথাটিও স্মরণীয় যে, "ভাবের প্রকাশ" বলতে প্রথমতঃ এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সীমিত অর্থে কোনো ভাব-বস্তুর যথা করুণা বা ঘৃণার প্রকাশ বুঝি না বরং সেই সঙ্গে কবি ও পাঠকের (বিশেষতঃ পাঠকের) মনোগত ভাব ও তাদের চৈতন্যস্বরূপেরও প্রকাশ বুঝি যে স্থলে এই ভাব বিরাজিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই 'প্রকাশ-কার্য'টি হয় প্রধানতঃ পরোক্ষভাবে বিভাব ও অনুভাবের মাধ্যমে কেননা ভাব কখনও লৌকিক রূপে প্রতিভাত হয় না। লৌকিক ভাবে আমরা শোক পাই যখন শোকের কোনো বাস্তবিক কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু অলৌকিক ভাবে, রস-রূপে যখন কাব্য-মারফত শোক-ভাবটিকে পাই তখন কোনো শোকার্ত ব্যক্তির কাল্পনিক রূপ পাই এবং তার শোকের কারণ রূপে কোনো ঘটনা বা বস্তুর এবং সেই শোকের বহিঃপ্রকাশরূপে 'অশ্রুপাত' 'শিরে করাঘাত' আদি শারীরিক বিবশতারও কল্পনা-কৃত অনুকৃতি পাই। প্রথমটিকে আলম্বন বিভাব, দ্বিতীয়টিকে উদ্দীপন বিভাব ও তৃতীয়প্রকার কাল্পনিক বিষয়টিকে অনুভাব বলা হয়। কল্পনাই এদের সত্তা—তাই এদের মাধ্যমে উদ্রিক্ত ভাব লৌকিক বা ব্যবহারিক রূপে পাঠককে বিচলিত করতে পারে না। এরা 'বিশেষ'-রূপেও প্রতিভাত হয় না কারণ যদিও কাব্যে যেমন একটি বিশেষ শোকার্ত ব্যক্তির বিশেষ শোকের কারণ-রূপ কোনো বিশেষ ঘটনার বর্ণনাই দেওয়া হয় এবং অনুভাবগুলিও সেই ব্যক্তির বিশেষ সময়ের শারীরিক বিকাশ হিসাবে বর্ণিত হয় তবু এ কথাও সহজবোধ্য যে যেহেতু এ সবই প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক—সেইহেতু এরা দেশ-কালে সীমাবদ্ধ বিষয়বস্তু নয়। কাব্যে এই ব্যাপারটিকে "সাধারণীকরণ" বলা হয়। ইহার দ্বারা বিভাব ও অনুভাবগুলি সকলের পক্ষে সমান—"সকল-সহৃদয়-সংবাদী" বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। সেইজন্য তারা আর বিশেষ বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো পাঠককে প্রভাবিত করে না বরং সার্বিক বস্তু-রূপে সকলের জ্ঞানের ও সহানুভূতির বিষয় হয়ে ওঠে। আর এই কারণেই তাদের দ্বারা দ্যোতিত ভাবও একটি সার্বিক রূপ-পরিগ্রহ করে রসের কারণ হয়[3] এবং এই রসও

3. অভিনব ভারতী, পৃ, ২৮৬, ২৯১। ধ্বন্যালোকলোচন, পৃ, ৫১।

সাধারণভোগ্য বিষয়-রূপে প্রতিভাত হয়—নিছক ব্যক্তিগত আস্বাদন ব্যাপার হয়েই থাকে না।[4] এই সাধারণীকরণ ব্যাপারটি ও ভাবের রসনিষ্পত্তির উপযোগী 'কারণ'গুলির বিস্তারিত আলোচনা ক্রমশঃ দেখা যাবে। এখানে এ কথা স্মরণীয় যে "ভাবের প্রকাশ" বলতে যে একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ-জ্ঞাপন করা হয় তেমনই "ভাবের জ্ঞান" অর্থে সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বোঝায় না বরং এমন-একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বা বোধকে ইঙ্গিত করে যা কেবল কাব্যপাঠের দ্বারাই সম্ভব হয়। কাব্যে বর্ণিত বিভাব অনুভাব-সাহায্যে পরোক্ষভাবে জাগরিত, ব্যঞ্জিত বা "ধ্বনিত" ভাবটিকে পাঠক ঠিক লৌকিক রূপে ভোগ না করলেও যেন সেটা লৌকিক এইরূপ ভান কিছুটা পাঠকের মনোজগতে সঞ্চারিত হয় এবং কাব্যবর্ণিত হর্ষ ঘৃণা রতি শোক আদিভাবের কিছুটা ভাবাপন্ন হয়ে সেই ভাবের আংশিক ভোগের মাধ্যমে ভাবটির স্বরূপ বা মর্মসত্যটির সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়টিকে ভাব বিষয়ে পাঠকের জ্ঞান বলা যেতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান—যা প্রত্যক্ষ বা অনুমান হতে পাওয়া যায় তার থেকে এবং যোগীদের অপরের ভাবসম্বন্ধে অলৌকিক জ্ঞান হতে পৃথক। এই রস-সম্পূর্ণ জ্ঞানেও আত্ম-চিত্তের মূল স্বরূপটির প্রকাশ ঘটে এবং সেইজন্য এক অপরূপ আনন্দের আস্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে এই জ্ঞানকে যোগীদের "একঘন" প্রতীতির সহিত একীকরণ করা চলবে না। কারণ সেই প্রতীতির মধ্যে বহির্বিষয়ক কোনো অনুভূতি (উপরাগ) থাকে না এবং তার আনন্দ এক বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়। তার রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে আনন্দ হয় বিচিত্র ও মনোরম বিভিন্ন ভাবসম্পৃক্তিতে। মানব রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে মানব হৃদয়ের সংস্কারগত কোনো বাসনার স্ফুরণ ঘটে ও তৎসম্পৃক্ত ভাবের (যা সেই বাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) অনুরঞ্জনে আনন্দঘন চৈতন্যকে জাগরিত করে।[5]

4. অভিনব ভারতী : [রসকে আত্মগত বা আন্তর ব্যাপার বলে অভিহিত করে রসবাদীরা। কিন্তু তাতে রসের সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা চলে না।]
5. অভিনব ভারতী, পৃ. ২৯১।

রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে যে আনন্দের অনুভূতি হয় সেটি সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আনন্দ হতে যেমন ভিন্ন তেমন আবার অসাধারণ যোগজ জ্ঞান থেকে পৃথক। যোগজ জ্ঞানের মতো এই রসপ্রতীতিতেও একটি শান্ত সমাহিত চৈতন্যের পরিচয় ঘটে—যার নিজস্ব আনন্দ আছে। কিন্তু রস-প্রতীতি সাধারণ মানুষেরও অলভ্য নয়—কারণ রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে ভাবের আবেশ ও সৌকুমার্যের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সাধারণ জ্ঞানের মতো রসপ্রতীতির বেলায় ভাবের বোধ জন্মে যা সাধারণ ভাব-সম্ভোগে অনুপস্থিত। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে চিত্তের সেই "একঘন"তা ও সার্বিক বা নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা আসে না যা রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে ঘটে এবং যার কারণে এই অনুভূতিকে "লোকোত্তর" "চমৎকার" বলা হয়। সুতরাং আমাদের "ভাবপ্রকাশ" কথাটির যথার্থ ও সম্যক কথাটি স্পষ্ট করে ধরতে হবে। এই অর্থের অধিকাংশই প্রচলিত অর্থ থেকে গূঢ়তর ও ব্যাপক। এই অর্থের সম্যক অনুধাবনে কাব্যানন্দের বিশেষ রূপটি এবং সেই সঙ্গে কাব্যের স্বরূপটি ধরা পড়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা ঃ কাব্যানন্দের মূল উৎসটি হল ভাবপ্রকাশ ও তার সঙ্গে আপন চৈতন্যের নৈর্ব্যক্তিক শান্ত স্বরূপটির প্রকাশ। এই আনন্দের সঙ্গে সাধারণতঃ অন্য কয়েক প্রকার আনন্দও সন্নিহিত হয়—যাদের ঠিক কাব্যা-নন্দের অন্তর্গত করা যায় না। এদের মধ্যে প্রথমটি হল কাব্যানুশীলন ও কাব্য উপভোগের মধ্য দিয়ে এক পাঠকের চিত্তের সঙ্গে অন্যের মিলিত হওয়ার আনন্দ। এই আনন্দটির বিশেষ আবির্ভাব ঘটে নাটক বা নৃত্যকলার ক্ষেত্রে—সেখানে অভিনব গুপ্ত বলছেন যে, রসানুভূতির জন্য বহুসংখ্যক দর্শকের প্রয়োজন, কারণ তাতে দর্শকচিত্ত এক সর্বজনীন নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা পরিগ্রহ করতে পারে এবং সেই অবস্থা থেকেই হয় রসের উৎপত্তি। কিন্তু অভিনবের এই উক্তি সম্ভবতঃ কিছুটা মতদ্বৈধের অবকাশ রাখে। কেননা যে-আনন্দ-ঘন সম্বিতের আস্বাদকে তিনি রস আখ্যা দিয়েছেন—তার আবার

'আত্ম-পর' জ্ঞান থাকে কি করে? এবং অন্যান্য দর্শক নাটকটিকে একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করছে কি করছে না—তার খবরই বা রসিক রাখবে কেন? এবং রাখলেও তার সঙ্গে রসিকের রসাস্বাদের সম্পর্ক কি? অপরের সমভাব ও রসপ্রতীতি নিশ্চয় সহৃদয় দর্শকজনের কাছে আনন্দকর—তথাপি এই আনন্দ কাব্যানন্দ নয়। অধিকন্তু এ কথাটি ভাববার যে 'দৃশ্যকাব্যে'র বেলায় যে কথা তবু বিচার্য মনে হয়— 'শ্রাব্য' বা 'পাঠ্য'কাব্যের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। যদিও কাব্যপাঠের বা শ্রবণের সময় যদি মনে মনে জানি যে এই কাব্য অনেকের হৃদয় জয় করেছে তা হলে পাঠক মনোলোকে অনেকের সঙ্গে এক একাত্মীয়তা লাভ ক'রে এক প্রকার চিত্তের প্রসার অনুভব করে। কিন্তু এই মানসব্যাপারটি বা তদ্‌জনিত আনন্দকে কোনো ক্রমেই কাব্যরসের অন্তর্গত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যালোচনায় কয়েক স্থলে সাহিত্যকে মানুষের সঙ্গে বহির্বিশ্বলীলা ও অপর মানুষের মিলনের সেতু হিসাবে দেখেছেন। মানবাত্মার ধর্ম হচ্ছে আত্মীয়তা করা" এবং এই আত্মীয়তার তাগিদেই সাহিত্য রচনা হয়। 'সহিত' শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। ধাতুগত অর্থ ধরলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখা যায়।[7] আবার সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জড়িয়ে যায়. তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।[8] সুতরাং রবীন্দ্রনাথও মানবাত্মার একটি বিশ্বমানবিক বিস্তৃত রূপ দেখতে চেয়েছেন যা বহুকে সম্বলিত করে বিরাজ করে এবং সাহিত্য বলতে এই বিরাট বিস্তৃত চৈতন্যের প্রকাশ ও আনন্দকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা এই ধরনের ব্যাপারটি ও অনুভূতিকে—যেটিকে সাহিত্য-রসের সঙ্গে একত্রিত দেখা যায়--তাদের এই রসের অনুষঙ্গ-হিসাবেই দেখতে বলি—সেই রসের অন্তরঙ্গ বলি না। টলস্টয়ও সাহিত্যকলার ধর্ম হিসাবে মানুষে-মানুষে মিলন সংঘটনাকেই জেনেছেন----In this freeing of our personality

৬. পঞ্চভূত (১ম সংস্করণ) পৃ. ৩১।
৭. সাহিত্য (১ম সংস্করণ) পৃ. ১০৯।
৮. সাহিত্যের পথে (১ম সংস্করণ পৃ. ৭০।

একটি সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করবে—প্রকারান্তে এই কথাই রবীন্দ্রনাথ ও ও কয়েক জন পাশ্চাত্য মনীষী ও কবি যেমন কীট্স, হেগেল ও এলিয়ট বলেছেন। কবি ও কাব্যামোদীকে জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা-সমূহকে এমন সুষ্ঠ ও সুসম অনুভূতি-সহকারে গ্রহণ করতে হবে যে প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়াটি হবে কাব্য-স্বীকৃত। কাব্যকলা কবি ও পাঠককে অপর পাঠকের সঙ্গে মেলায়। সাহিত্যের মাধ্যমে এই মানুষে মানুষে সম্মেলনের মূলে আছে সাধারণীকৃতি-ব্যাপারটি যার ধারণা প্রথম পাই ভট্টনায়কের কাছে এবং সে ধারণাটির স্পষ্টতর ব্যাখ্যা পেয়েছি অভিনব গুপ্ত ও পরবর্তী আলংকারিকদের কাছে।

অতএব দেখা যায় পাঠকের চিত্তের সাধারণীকৃতির অভাবের জন্য পাঠকও যেমন দায়ী, কবিও তেমনই হতে পারেন। অপিচ, পাঠকচিত্তকে উপযুক্ত অবস্থায় আনবার উপায় হিসাবে ভরত ও অভিনব নাট্যকলা-প্রয়োগে বিচিত্র রঙে ঢঙে রঙ্গমঞ্চ সজ্জা, রূপযৌবনযুক্ত কলাকুশল নটনটীর অপরূপ অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জা, সুন্দরী নিপুণা নর্তকীবৃন্দ এবং নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতির সময়োপযোগী সমাবেশ করার উপদেশ দেন যার দ্বারা পাঠক বা দর্শকের পরিমিত ব্যক্তিসত্তা বা আত্মবোধ অন্তর্হিত হয়ে তার বৃহৎ ও ব্যাপক আত্মসত্তার প্রকাশ হয়। রঙ্গালয়ের প্রাণবন্ত বিচিত্র উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে দর্শক তার সংকীর্ণ দেশকালাশ্রয়ী মানসিকতা বিস্মৃত হয়ে এক সার্বিক চিত্তভূমিতে আরোহণ করে। তা ছাড়া নাট্যাভিনয়ে থাকে বিভিন্ন প্রকারের অভিনব -কৌশল--যেমন, বাচিক, আঙ্গিক, (অঙ্গভঙ্গী যোগ), সাত্ত্বিক (অশ্রুবর্ষণ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতির প্রদর্শনে ভাবপ্রকাশ) ও আহার্য (পরিধেয় বা সাজসজ্জা-সাহায্যে নানাবিধ ভাবাভিনয়)।

বিভিন্ন প্রকারের নাট্যবৃত্তির বা styleএর যথোচিত সমাবেশ, যেমন শৃঙ্গার-রসের অভিনয়ের জন্য উল্লাসকর ওজস্বিনী 'কৈশিকী-বৃত্তি' ও রৌদ্র রসোদ্গমের জন্য গম্ভীর 'স্বাত্তী' বৃত্তি সাহস, দৃঢ়তা প্রভৃতির ভাবাভিনয়ের উপযুক্ত।

এই-সকল প্রযুক্তি এবং উপকরণ দর্শককে সহৃদয় করে তুলতে সহায়ক হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে---তাহলে কাব্যের বেলা কি হয়? এর উত্তরে

ভট্টনায়ক বলেন যে কাব্যের বিবিধ গুণ এবং অলংকারের প্রভাবে পাঠকচিত্তের সাধারণীকরণ হয় ও কাব্যপাঠকের সহৃদয়ত্ব উদ্বুদ্ধ হয়। অভিনবও অনেকাংশে এই মতের সমর্থন করেন।

বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের মতে কাব্যের শব্দপ্রয়োগের ফলে বর্ণিত বিষয়বস্তু এমন স্পষ্টভাবে মানসদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে তা নাট্যাভিনীত বস্তু সকলের মতই চিত্তকে প্রভাবিত করে। যদিও অনেকের মতে কাব্যের ক্ষমতা এ বিষয়ে নাটকের সমতুল্য নয়, তবু কাব্যে শব্দ-পাঠ দ্বারা 'অভিধেয় 'লাক্ষণিক' এবং 'ব্যঞ্জিত' অর্থের অনুধাবনায় ও তাব ছন্দ, মিল ও বিবিধ অলংকারের সৌন্দর্য উপভোগ কবায় ব্যাপৃত পাঠকচিত্ত স্বতঃই তার সংকীর্ণ ব্যবহারিক বোধ ছেড়ে আর-এক বৃহত্তর এবং অলৌকিক চৈতন্যভূমিতে উন্নীত হয়।

কাব্যরসাস্বাদনের আর-একটি বিঘ্ন কবির দোষে উপস্থিত হতে পারে এবং তার প্রতিকারও কবির হাতেই সম্ভব। কোনো এক কাব্যে একটি রসকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং এই রসটি যে ভাবকে আশ্রয় করে থাকবে তা একটি স্থায়ীভাব হওয়া চাই---অর্থাৎ 'রতি' 'হাস' 'শোক' 'ক্রোধ' আদি ভাবের একটি—যেগুলি মনুষ্য-চরিত্রে ব্যাপক ও দৃঢ় নানা আকারে অবস্থিত। মানুষ এইরূপ কতকগুলি বাসনা ও সহজাত বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং এরা এমনই ব্যাপক ও দৃঢ়মূল যে এমন কেহ নেই (কদাচিৎ ছাড়া) যে এদের প্রভাব হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে। যদি কেহ দীর্ঘকাল এদের কোনোটির চরিতার্থতা না করে তা হলেও তার সেই বাসনার নিবৃত্তি হয় না—বরং তা চিত্তে সুপ্ত থাকে এবং সুযোগ পেলেই জেগে ওঠে। তা হলে কাব্যে এইরূপ একটি স্থায়ীভাবকে প্রধান না করলে পাঠকের মন বেশিক্ষণ কাব্যে অভিনিবেশিত হবে কেন? যে ভাবটি তার মনের উপর প্রাধান্য বা প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে তার অর্থ ও আকর্ষণ প্রগাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ভাবপ্রকাশ বা প্রতিরূপায়ণই কাব্যে প্রাধান্যলাভ করবে এবং অন্য সকল ভাব যেমন, 'লজ্জা' 'বিষাদ' 'গর্ব' ইত্যাদি অপ্রধান হয়ে সেই প্রধান ভাবকে প্রকাশ করায় সাহায্য করবে।

আশা করছি এবার আমরা সাধারণীকৃতি' ব্যাপারটির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমের পথে কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছি। কাব্য বা নাটকের রসপ্রতীতির মূলে আছে অনেকগুলি ব্যাপার (তার মধ্যে প্রধানটির আলোচনাই এতক্ষণ হল) যাদের অনুকূল সংঘটনার উপর নির্ভর করে সেই সাধারণীকৃতি এবং রসপ্রতীতি।

এই সংঘটনগুলির কিছু পাঠক বা দর্শকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং কিছু কবি বা নাট্যকারের সহিত। কবি বা নাট্যকারের চিত্তেই ভাব রসোত্তীর্ণ হয় এবং তা পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই দুই পক্ষের পরস্পরের সহযোগে কাব্য বা নাটকের রসনিষ্পত্তি সম্ভব হয়।

কাব্য-রচয়িতার চিত্ত নৈর্ব্যক্তিক বা বৃহৎ ব্যক্তিক হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তাঁর কাব্য বা নাটক রচনার জন্য দক্ষতা থাকা প্রয়োজন— যা তাঁর রচনা-পাঠে বা ভাবসৃষ্টিতে পাঠক বা দর্শকের চিত্তকে 'সাধারণীভূত' বা নৈর্ব্যক্তিক হতে সাহায্য করে রসাস্বাদনের উপযোগী করে। অবশ্য পাঠক বা দর্শককেও এ বিষয়ে যত্নবান্ হতে হবে। তাঁকে জীবন জগৎ ও কাব্য-নাটক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং রসিক হতে হবে—তা ছাড়া, কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনের সময় তাঁকে আপন ব্যবহারিক জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রিয়-অপ্রিয় বোধ ইত্যাদি মনোভাব তাৎকালিকভাবে অপসারিত করে একটি অতিশয় সহানুভূতিশীল অথচ (এক অর্থে) অনাসক্ত, সর্বব্যাপক ও সর্বজনপ্রতিভূ মানসিকতার বা চিত্তধর্মতার অধিকার লাভের জন্য ইচ্ছুক হতে হবে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, চিত্তের সংবেদনশীল রুচিবোধ ও রস গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আর কবি বা নাট্যকারের সার্থক সাধারণীভূত রসোচ্ছ্বল প্রতিভা এবং কাব্য বা নাট্যরচনার দক্ষতা এই দুইয়ের সংযোগেই কাব্যে বর্ণিত ও নাট্যে প্রতিরূপায়িত বস্তু, চরিত্র ও ভাবসকলের 'সাধারণীকৃতি' ব্যাপারটি সফল হয়, অর্থাৎ তারা পাঠক বা দর্শকের চিত্তে তাদের দেশকালাতীত 'সকল-হৃদয়-সংবাদী' তাত্ত্বিক বা ভাবরূপে ধরে আবির্ভূত হয় এবং এই কারণে তাদের মাধ্যমে ভাব বা রসরূপে প্রকাশ

পায়। রসনিষ্পত্তির এই ব্যাখ্যার পৃষ্ঠভূমিতে আছে একটি মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মদর্শন—যা এর পর আলোচিত হবে।

অষ্টম কথা ঃ রসোৎপত্তির ব্যাখ্যায় আমরা অভিনবকে অনুসরণ করে একটি মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-দর্শনকে বাহ্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছি—তার স্পষ্ট ও পরিস্ফুট উল্লেখ এবং বিচার প্রয়োজন। মানবচিত্ত বা ব্যক্তিত্বকে আমরা দুইটি স্তরে ভাগ করেছি ঃ প্রথমটি তার সাধারণ ব্যবহারিক স্তর—যেখানে সে সাংসারিক ব্যক্তি হিসাবে জগতের সকল বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রয়োজনসিদ্ধির মনোভাব আসক্তি রুচি এবং নীতিবোধ নিয়ে সম্পর্কিত। অন্যটি হল আর এক স্তর--যা অব্যবহারণীয় বা অলৌকিক—যেখানে সে বিশ্বচরাচরের কোনো কিছুকেই তার জাগতিক বা জৈবিক প্রয়োজনবোধ দিয়ে দেখে না বরং সকলই সুন্দর বলে ভালোবাসে। আলংকারিকদের মতে এই স্তরটিকে সাধনা দ্বারা পরিস্ফুটিত করতে হয় এবং কাব্য ও নাট্যকলানুশীলন এই সাধনার সহায়ক। কারণ কাব্য বা নাট্যকলার রসগ্রহণের জন্য চিত্তের এই রসপ্রবণতা একান্ত প্রয়োজন। চিত্তের এই রসোন্মুখতা এবং রসপ্রতীতি তখনই সম্ভব হয় যখন সে তার ক্ষুদ্র ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য ছেড়ে একটি বৃহৎ আত্মবোধ লাভ করে। একটিই চিত্তের 'সাধারণীকৃত' সংঘটন যার সাহায্যে সার্থক কাব্য বা নাট্যকলার সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে সুকবি বা বিদগ্ধ নাট্যকার তাঁর হৃদয়ের সাধারণীভূত ভাবকে পাঠক বা দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করতে সফল হন। কাব্যের ছন্দ মিল অলংকার ও নানা বিভব—বিশেষতঃ নাটকের বিচিত্র আবেদন পাঠক বা দর্শক-চিত্তকে তার পরিচ্ছিন্ন ব্যবহারিক ব্যক্তিবোধ হতে সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি দেয়।

এই দুইটি স্তর বা অবস্থার কথা অনেক পাশ্চাত্য সাহিত্য-মীমাংসক স্বীকার করেন এবং কাব্যকে এক অনাসক্ত অলৌকিক আনন্দ (disinterested extraordinary pleasure) বলে অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মীমাংসাতেও এই স্তরভেদ সুস্পষ্ট। তিনি রসানুভূতির মধ্যে মানবাত্মার একটি 'বেহিসাবী' দিক দেখেছেন যা 'আত্মীয়তার বাজে কাজে' ব্যাপৃত থাকে। সৌন্দর্য এই প্রয়োজনাতীত

আধ্যাত্মিক কার্য হতে সৃষ্ট এক অলৌকিক আন্তর বস্তু। সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় হৃদয়ের ওই হৃদয়ধর্ম হতে যেখানে মানবহৃদয় চায় বাহিরের বস্তু ও অপর হৃদয়ের সঙ্গে অনাবিল মিলন। কিন্তু 'শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে' (যা অভিনব গুপ্তের চিন্তার অধিষ্ঠান) এই দুইটি স্তরের অস্তিত্বকে যতখানি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—তা অন্যত্র দেখি না।

প্রত্যভিজ্ঞাবাদীদের মতে আমাদের চৈতন্যের তিনটি অংশ আছে যার সাহায্যে 'আমি আছি' 'আমি জানি' ও 'আমি সুখী' এইরূপ অনুভব হয়। এই অংশগুলি সাধারণত আবরক দিয়ে আংশিকভাবে আচ্ছাদিত থাকে—যার কারণে মানুষ বা ব্যক্তি চৈতন্য-জগতের সমস্ত 'বিষয়'বস্তুকে ও নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানে ও আনন্দে উপলব্ধি করতে পারে না। সে কিছু বিশেষ বস্তুকেই জানে এবং তার দ্বারা আনন্দ লাভ করতে পারে। অন্য কথায় তার জ্ঞান ও আনন্দ পরিমিত—বিস্তৃত নয়। পক্ষপাত-শূন্যভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে না তার জ্ঞান আর আনন্দ—আর সে নিজের সত্তা বা চৈতন্যস্বরূপকেও আংশিক ও সন্দিহানভাবে জানে। কাব্য বা নাটকের রসাস্বাদনের সময় পাঠক বা দর্শকের উচ্চতর চৈতন্যে সেই আবরণগুলি ভেঙে যায় এবং সে তার পূর্বের খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন অহংতা বা আত্মবোধ ছাড়িয়ে এক অখণ্ড পরিব্যাপ্ত অহংতায় উপনীত হয়। এই অবস্থাকে বেদান্ত-দর্শনের 'জীবন্মুক্ত' অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—যেখানে মানবচিত্ত অহংকার-শূন্য হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা বেদান্ত-মতে এমন বিচিত্র, আনন্দময় ও রসপূর্ণ বর্ণিত হয় না যা 'শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে' পাই। কারণ তখন এই দ্বিতীয় দর্শন মতে চৈতন্য তখন গভীর সংবেদনাশীল হয়ে সকল বিষয়ের সহিত তন্ময়তাপ্রাপ্তির যোগ্য হয় এবং সকল রকম অভিজ্ঞতাই আগ্রহ ভরে উপভোগ করে ও গভীর আনন্দ লাভ করে। বেদান্ত-মতে চৈতন্য জীবন্মুক্ত অবস্থায় উদাসীন-ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তার সুখ-দুঃখ কিছুরই বোধ থাকে না। সাংখ্য-মতের সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিদ্বারা আবৃত চৈতন্যের সঙ্গে এই রসচর্চারত সাধারণীভূত চৈতন্যের তুলনা করলে দুইয়ের মিল ও বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে। প্রধান

বৈলক্ষণ্য এই রসপ্রতীতির আনন্দ—দুঃখস্পর্শরহিত নির্বিশেষ আনন্দ এবং তা চৈতন্যের ধর্ম বলে রসবাদী জানেন, কিন্তু সাংখ্যমতে 'চৈতন্য' বা 'পুরুষের' 'আনন্দ' বা 'নিরানন্দ' কোনোই ধর্ম নেই। কারণ আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকৃতি বা জড়ের ধর্ম এবং চৈতন্যে তাদের ছায়া পড়ে মাত্র ও চৈতন্য এদের আপন বলে ভ্রম করে। তা ছাড়া, প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান হলেও সেখানে রজঃ ও তমোগুণের সম্পূর্ণ অপসরণ হতে পারে না কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং রসপ্রতীতির আনন্দ (সাংখ্য-মতে) দুঃখ স্পর্শহীন অনাবিল সুখ হতে পারে না। ভট্টনায়ক ও অভিনব গুপ্ত দুজনেই কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন এবং 'শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে' বিশ্বাসী ছিলেন (ওই শাস্ত্রচর্চা তখন ঐ অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল)। যদিও এঁদের সাহিত্য-মীমাংসা সম্বন্ধে রচনায় স্থানে স্থানে সাংখ্য্য ও বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি কথা পাওয়া যায় কিন্তু তার থেকে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বা তাঁদের চিন্তাধারাব পটভূমি যে সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শন ছিল তা মনে বরা সংগত হবে না। ভট্টনায়ক সাধারণীভূত চিত্তের রসপ্রতীতির আনন্দকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরা' বলেছেন। অভিনবও একই বথা বলেন। তবুও তাঁরা এই রসপ্রতীতিকে রসাস্বাদী সহৃদয়-চিত্তভূতি ও তার বিশেষ আনন্দকে বৈদান্তিক যোগীদের ব্রহ্মানুভূতির অবস্থা হতে ভিন্ন বলেও জেনেছেন। ভট্টনায়ক এক স্থলে বলেছেন : রস গাভীর দুগ্ধের মতো স্বতঃই গোবৎসের জন্য প্রস্রবিত হয়, এর থেকে যোগীদের (ব্রহ্মানন্দের) আনন্দ-রসের বৈলক্ষণ্য এইখানে যে তাদের এই রস দোহন করতে হয়।

অভিনবও বলেন যে, যোগীদের আত্মদর্শনের অনুভব হতে রসাস্বাদের তফাত এই যে প্রথমটিতে দ্বিতীয়টির মতো সৌন্দর্য নেই—তা এক প্রকার চিত্তের রিক্ত বা শূন্য অবস্থা—যেখানে চন্দ্র সূর্য ও বিশ্বচরাচর সকলই বিলীন হয়ে যায় শিব বা ভৈরবের ধ্যানে। এই তুরীয় অবস্থায় আত্মার আনন্দময় স্বরূপটুকু মাত্র আর যোগ-ধ্যানের কেন্দ্র বা বিষয়রূপে দেবতা বা শক্তি বিরাজিত থাকে। কিন্তু রসাস্বাদের বেলায় চিত্তে কোনো বাসনা—যেমন রতি শোক হর্ষ বিষাদ বা উৎসাহ রস-রূপে স্ফুরিত হয়ে চিত্তকে অনুরঞ্জিত বরে। রসাস্বাদন সহৃদয় চিত্তের আনন্দ,

তাই যোগীদের আনন্দের মতোই মূলতঃ আপন সম্বিতের অনুভব-জনিত হলেও এর মধ্যে এমন সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য ওতপ্রোত আছে যা দ্বিতীয়টিতে অবর্তমান। প্রথমটি তাই পেলব অনুভূতি-নন্দিত সুকুমার মনন-শিল্পীদেরই উপযোগী এবং দ্বিতীয়টি তপঃক্লেশসহিষ্ণু যোগীদের সাধনযোগ্য।

এখন দেখতে হবে যে, কাব্য-মারফৎ ভাব কি প্রকারে সাধারণীভূত অবস্থায় পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সাধারণতঃ আমরা বলি ও মনে করি যে—কবির হৃদয়ের ভাব কাব্যে ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং সেই কাব্যপাঠে পাঠকের চিত্তেও সেই ভাবটির উদয় হয় এবং যেহেতু কবি ও পাঠক দুজনেই 'সহৃদয়' সুতরাং তাদের ভাব একান্ত নিজস্ব রূপটি ত্যাগ করে একটি সাধারণ বা সর্বজন-বোধ্য রূপ ধরে। সুতরাং 'হৃদয়-সংবাদ' সম্ভব হয়। একেই বলে থাকি কাব্যের 'রস-পরিণতি'। অভিনীত নাটকের বেলায় বলে থাকি নটনটীর মনের ভাব তাদের বাচনিক আঙ্গিক সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়গুণে দর্শকের মনে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এইরূপ সরল ব্যাখ্যারও কিছু ত্রুটি আছে। অভিনবের মতে কাব্য বা নাটকের রসাস্বাদ একান্তই সহৃদয়ের আন্তর ব্যাপার। সুতরাং কোনো বহির্বিষয় এই রসাস্বাদের কারণ হতে পারে না। সহৃদয়ের নিজের অন্তরের অনাদি অনন্ত রস-চৈতন্যই রসাস্বাদনের পরম ভোক্তা। তাই কাব্যে বর্ণিত বা নাটকে অনুকৃত বিভাব অনুভাবের মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা বা সাক্ষাৎদর্শন দ্বারা—এরা সবই বস্তুতঃ তার মানসগত বিষয়বস্তু—কারণ (যেমন বিজ্ঞানবাদীরা বলেন) মনের বাহিরে অপ্রত্যক্ষিত বস্তুর অস্তিত্ব নেই—যেহেতু মন তা জানতে পারে না। 'সহৃদয়ে'র চিত্তে স্থায়ীভাবের উদয় তার বাসনালোক হতেই হয় এবং এই স্থায়ীভাবের কোনো লৌকিক বা ব্যক্তিগত ধর্ম বা পরিণতি থাকে না কিংবা এক কথায় তা সাধারণীভূত এবং তার মূলে কোনো লৌকিক কারণ বিদ্যমান থাকে না। কাব্যাশ্রিত বিভাব অনুভাব অলৌকিক বস্তুমাত্র এবং এদের সংযোগে স্থায়ীভাবটির চিত্তে আবির্ভাব হয়। এখানে 'সংযোগ' অর্থে এই বিভাব-অনুভাবগুলির পরস্পরের সহিত সংযোগ বোঝায়, আবার

(অভিনব-মতে) পাঠক বা দর্শকের চিত্তের সহিত তাদের সংযোগ বা তন্ময়তাও বোঝায়। এখন এই কয়েকটি বাসনা যে আমাদের সকলের মধ্যে সর্বদাই থাকে তা অনস্বীকার্য এবং অভিনব এদের প্রতিষ্ঠা করে এদের সাহায্যে কাব্য-জিজ্ঞাসার দুটি সর্বতোস্বীকৃত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমটি এই যে, রসার্চনা পাঠকের (বা দর্শকের) আন্তর ব্যাপার—সুতরাং তার নিজের স্থায়ীভাবের উপভোগ। আর দ্বিতীয়টি পাঠক (বা দর্শক) সাধারণতঃ নিজের থেকে অনেক বিলক্ষণ চরিত্র ও তাদের নানা বিচিত্র ভাবাবেশের সঙ্গে অনায়াসে (যেমন শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার সীতা-বিসর্জনজনিত বেদনা) সহানুভূতি বোধ করতে পারে। তা না হলে তার পক্ষে কাব্য বা নাটকের অতি-পরিমিত অংশেরই রসগ্রহণ সম্ভব হত। পরন্তু, অভিনব শুধু এই কথামাত্রই বলেন না যে কয়েকটি বাসনা বা স্থায়ীভাব আমাদের সকলের মধ্যে বিদ্যমান—বরং আরও প্রগাঢ় অধিবিদ্যা-তত্ত্বের কথা বলে কাব্য বা নাটকের ব্যাপক আবেদনের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের চৈতন্য অনাদিকাল হতে নানা জীব, নানা স্তর ও অবস্থার মানুষের আকার ধারণ করে অভিজ্ঞতার অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে চলেছে। সুতরাং একটি মানুষ আজ যে অবস্থায় আছে তাই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়—সে সমুদয় জীব-সকলের সবপ্রকার অভিজ্ঞতার সঙ্গেও পরিচিত। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার সঞ্চিত আছে তাঁর চৈতন্যে এবং কাব্য বা নাটকে, যখন কোনো জীব বা মানুষের বর্ণনা বা অনুকৃতি পায়—তখন সে তার সঙ্গে নিজকে একীকরণ করে তার ভাবটিকে আপনারই ভাব বলে উপভোগ করে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে এই সহানুভূতি ও ভাবভুক্তি লৌকিক নয়—যেখানে ভোক্তা রসানুভূতির আনন্দের পরিবর্তে ভাবটির সুখ-দুঃখ-গুণ দ্বারা অভিভূত হয়ে সুখী বা দুঃখী হয়। আর আগের ক্ষেত্রে সে ভাবটিকে লৌকিক রূপে 'ভোগ' (suffer) না করে সেটিকে 'উপভোগ' (enjoy) করে। একেই ভাবের ও পাঠক বা দর্শকের 'সাধারণীকৃতি' বলে। এইসঙ্গে লক্ষণীয় যে এখানে পাঠক বা দর্শকের নিজেরই ভাবের অভিব্যক্তি হয়, অন্যের ভাবের ভুক্তি হয় না। অভিনবের

কাব্য-মীমাংসাকে 'অভিব্যক্তি-বাদ' এবং ভট্টনায়কের মীমাংসাকে 'ভুক্তিবাদ' বলা হয়। ভট্টনায়কের মতে কাব্যের রসনিষ্পত্তির মূলে কাজ করে তিনটি শক্তি। প্রথমটি শব্দের অভি বা শক্তি, দ্বিতীয়টি অর্থের ভাবনা-শক্তি যার বলে শব্দ-দ্বারা অভিধেয় পদার্থসমূহ একটি অলৌকিক আপন-পর-সম্বন্ধ-রহিত অবস্থায় চিত্তে আবির্ভূত হয়—যাকে সেই মানস-গত পদার্থসমূহের সাধারণীভূত অবস্থা বলা হয় এবং যে অবস্থায় তাদের বিভাব অনুভাব ও ভাব এইরূপ শ্রেণীভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হয়। তৃতীয় ভাবাশ্রয়ী পাঠক বা দর্শকচিত্তের 'ভোগীকৃতি' শক্তি—যার বলে পাঠক বা দর্শকের রসপ্রতীতি হয়। অভিনব শেষের দুইটি শক্তি ও তাদের কার্যকারিতা অস্বীকার করেন—কারণ তারা অনুভব-বিরুদ্ধ। অভিনবের মতে কাব্যে-বর্ণিত বা নাটকের-প্রতিরূপায়িত পদার্থসকল (অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ভাব) যে সাধারণীভূত অবস্থায় প্রকাশিত হয়—তার মূলে ভাবনা ও ভোগীকৃতি শক্তিদ্বয়ের কল্পনার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সহৃদয় চিত্তে সেই পদার্থসকল স্বতঃই এই অবস্থা-প্রাপ্ত হয় এবং রসপ্রতীতি জাগায় এবং এই ব্যাপারের সরল ব্যাখ্যা 'ধ্বনন' ব্যাপার বা 'ব্যঞ্জন'-ব্যাপার দ্বারা সম্ভব।

কাব্যে শব্দ-দ্বারা বিভাব অনুভাব বর্ণিত হয় এবং নাটকে নটনটীর আবির্ভাব ও তাদের বাচনিক আঙ্গিক সাত্ত্বিক এবং আহার্য অভিনয় দ্বারা এদের মানস-গোচর করা হয়। এই চিত্ত-অনুভাব পাঠক বা দর্শকের হৃদয়গত ভাবকে সেই পরম চৈতন্য বা ভাবটির মাঝে লয়প্রাপ্ত করে লাভ করে এক সার্বিক ভাবের অভিব্যক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে আপন ভাবময় সত্তা বা সম্বিতের আস্বাদন।

রসাস্বাদনের এই ব্যাপারটি সম্ভব হয় ধ্বনি দ্বারা। কাব্যের শব্দ ও নাটকের সংলাপ এবং তাতে প্রদর্শিত বিভাব অনুভাব এরা সকলেই ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত করে ভাবকে এবং ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত ভাবই রস-রূপে প্রতীত হয়। বিভাব-অনুভাব (অর্থাৎ বস্তুর) ও অলঙ্কার সমূহও ধ্বনিত হয় তবে শেষপর্যন্ত এসবের উদ্দেশ্য 'রস' এবং রস-ধ্বনিই রসধ্বনন-ব্যাপারের প্রধান কাজ। ভট্টনায়ক ধ্বনিবাদ অস্বীকার করেন কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর ভাবনা ও ভোগীকৃতি ব্যাপার দিয়ে রসের

ব্যাখ্যাটি দোষশূন্য নয়। ভট্টনায়কের পূর্বে ভট্টলোল্লট এবং শঙ্কুক ভরতের রসসূত্র 'বিভাব-অনুভাব ও ব্যভিচার-ভাবের সংযোগ দ্বারা রসনিষ্পত্তি ঘটে'—এই ভাষ্যের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার বর্ণনা অভিনবের রচনায় পাওয়া যায়। প্রথম জনের মতানুসারে আমরা বলতে পারি যে—রস উৎপন্ন হয় প্রকৃতপক্ষে অনুকার্য নায়কের চিত্তে উপযুক্ত বিভাগ-অনুভাব ও ব্যভিচার-ভাবের দ্বারা যেমন মহারাজা দুষ্মন্তের লাবণ্য-রূপিণী শকুন্তলা-সন্দর্শন ও নয়নাভিরাম তপোবন পটভূমির অনুকূল পরিবেশের গুণে (যারা বিভাবের কাজ করে) তীব্র অনুরাগে (রতিভাব) আকুল হয় এবং তার এই ভাবের প্রকাশ অঙ্গের নানাবিধ ভঙ্গী ও মুদ্রা (যথা,স্বেদ,কম্প, লোচন ও করবিন্যাস আদি) দ্বারা হয় এবং কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী ভাব যেমন শঙ্কা, অসূয়া, গ্লানি প্রভৃতি দ্বারা উপচিত হয় বা পুষ্টিলাভ করে। মূল রতিভাবই এইরূপে উৎপন্ন এবং উপচিত হয়ে রস-আকারে ধরে। আর এই 'রস স্থায়ীভাব রতি হতে স্বরূপতঃ পৃথক নয়। নাট্যে অনুকৃত নটের (বা কাব্যে-বর্ণিত ও মানস-চক্ষে উপস্থাপিত চরিত্রের) উপর অনুকার্য নায়কের (যেমন দুষ্মন্তের) ও তাহার ভাবের (যথা রতিভাবের) আরোপ হয় এবং এইরূপ আরোপই একপ্রকার আরোপিত চরিত্র ও ভাবের অলৌকিক সাক্ষাৎকার এবং ভাবের এই-প্রকার 'সাক্ষাৎকার'ই রসাস্বাদ। ভট্টলোল্লটের এই মতের প্রধান ত্রুটি এই যে, এখানে দুষ্মন্তের লৌকিক ভাবকে রসের সঙ্গে একীকরণ করা হয়েছে। অথচ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে এই দুইয়ের পার্থক্য কত মৌলিক। উপরন্তু এ কথাও অনুভব-বিরুদ্ধ যে—মহারাজা দুষ্মন্তের প্রেম-বিহ্বল অনুরাগ বা রতিভাবার্পনে অথবা দুষ্মন্তের অনুকর্তার উপর সেই রতিভাবের আরোপ দ্বারা (কিংবা 'অলৌকিক' সাক্ষাৎকার দ্বারা) কারও প্রেমভাব (শৃঙ্গার-রসের) আনন্দানুভব হতে পারে। শঙ্কুকের মতে দর্শকের চিত্তে নটাশ্রয়ী রতিভাবের অনুমান হয় এবং তার ফলেই রসাস্বাদ হয়। কিন্তু এ যুক্তিও অনুভব-বিরুদ্ধ এবং ভট্টনায়ক এর সমালোচনা করে তাঁর 'ভুক্তিবাদ' প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাকে খণ্ডন করে অভিনব তাঁর 'অভিব্যক্তি-বাদে'র

অবতারণা করেন।

আমরা অভিনবের মতটিকে সমর্থন করি বটে—তবু এ কথাও বলতে হয় যে অভিনবের বিজ্ঞানবাদ আমাদের পক্ষে অনিবার্য নয়। রস ও ভাব যে কেবল কবি বা নাট্যকারের এবং পাঠক বা দর্শকের চিত্ত ব্যতীত থাকতে পারে না—এ কথা না মানলেও চলে। যেমন সাধারণতঃ নীল লাল রঙ বা মিষ্ট ও তিক্ত-রস সাক্ষাৎ প্রতীতি ছাড়াও বিষয়রূপে বিদ্যমান বলেই আমরা মনে করে থাকি এবং এদের অস্তিত্ব ব্যক্তি-প্রতীতিতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ বস্তু—যার প্রতীতি স্বতঃই মানবচিত্তে আবির্ভূত হয়। এই রকম ধারণাই স্বাভাবিক এবং এর সপক্ষে বাস্তবপন্থীদের যুক্তিও সারবান। বিভিন্ন প্রকারের ভাব ও রস, বিভিন্ন প্রকারের রঙ, শব্দ, গন্ধ বা আস্বাদের মতোই সামান্য বা সর্বজনীনভাবে প্রতীত হয়। এই প্রতীতির 'সামান্য'তার ব্যাখ্যাটি তাহলে কি? এগুলির প্রত্যেকটির এক একটি 'সামান্য' রূপ (বা আদর্শ-আকার অথবা ভাব-সত্তা) মনে করতে হয়—যা উপযুক্ত অবস্থা-সমাবেশে বাস্তব-আকার পায় কোনো ব্যক্তি-মানসের সাক্ষাৎ-প্রতীতিতে। একেই ভাববাদী বস্তুবাদ (idealistic realism) বা বিষয়নিষ্ঠ ভাববাদ (objective idealism) বলা হয়। এইরূপ দর্শনভঙ্গীই আমাদের সহজাত ও আমাদের সাধারণ ভাষাপ্রয়োগের মূলে অবস্থিত। সাহিত্য-মীমাংসায় এইরূপ সহজাত দর্শনকেই আলোচনার পৃষ্ঠভূমি বা অধিষ্ঠানরূপে স্বীকার করে নেওয়া সংগত মনে হয়। তা না হলে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অভিনবের দর্শন-দৃষ্টি-অনুসারে রস 'রসপ্রতীতি' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কিন্তু তা হলে রসের সামান্য-রূপ ও তার একটি সর্বনাম-করণ এবং সংজ্ঞা-নিরূপণ সম্ভব হত না। রস-পদার্থের ভাবগত বাহ্যসত্তা স্বীকার করাই সমীচীন মনে হয়। তা ছাড়া অভিনব তো তাঁর দর্শনে স্থায়িভাব বা 'বাসনা'র এইরূপ বাহ্যসত্তাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করেন বলা যায়, কারণ অভিনব বলেন স্থায়ীভাবগুলি মনুষ্যচিত্তে 'সংস্কার' রূপে সুপ্ত থাকে।

এইরূপ অবস্থায় তা হলে অস্তিত্ব কিরূপে বোঝা যায়? ভাবটির একটি

'সামান্য' ও 'অমূর্ত' ভাবসত্তা কল্পনা করতে হয় এবং চিত্তে বাস্তবিক ক্ষেত্রে ভাবোদ্রেকের ব্যাপারে এই অমূর্ত সামান্যরূপ ভাবটির এক বিশেষ মূর্তি-পরিগ্রহ ঘটে—সরল কথায় ভাবটি বাস্তব-জগতে আত্মপ্রকাশ করে। ভাবের সাধারণীকরণ বুঝতে হলে আমাদের এই 'দেশ-কাল-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ' মুক্ত নিরাশ্রয়ী ভাবের অমূর্ত সামান্য-সত্তাকে কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। ভাবের বিশেষ কোনো বাস্তবিক প্রকাশ বৃত্তিরূপে চিত্তে আলোড়িত হয়। সেটি ভাবের লৌকিক রূপ—যা নিতান্তই ব্যক্তিগত ভাবে মানুষে ভোগ করে। ভাবের সামান্য ভাব-ভিত্তিক রূপ যাকে ভাবটির স্বরূপ বা মৌলিক সত্তা বলা যায়—সেটি হল অধিবিদ্যক জ্ঞানের বিষয়। এই 'বাঞ্ছিত'কেই কাব্যকলার মাধ্যমে কবি বা শিল্পী 'সহৃদয়ে'র চিত্তে উদ্বোধিত করতে চান ; দার্শনিক যাকে ধরতে চায় বিচার আর বৌদ্ধিক সংজ্ঞা-সাহায্যে, কবি বা শিল্পী তাকেই পেতে চায় তার রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় মূর্তিতে। অথচ সেটি প্রকৃতপক্ষে অমূর্ত অবাস্তব দেশ-কাল-ব্যক্তি-সম্পর্ক-শূন্য ভাব-পদার্থ মাত্র। সুতরাং যেসব উপকরণ—যেমন, বিভাব-অনুভাব বা ব্যাভিচারী-ভাব-সাহায্যে এই অমূর্তের কাব্যিক বা শৈল্পিক প্রকাশ সাধিত হয়—সেগুলি বাস্তবানুকরণ হয়েও অবাস্তব এবং মূর্তিমান হয়েও ভাব-শরীরী। যথা, রতিভাবের উপমায় 'আলম্বন-বিভাব' হিসাবে প্রেম-ব্যাকুল সম্রাট দুষ্মন্ত ও তার 'উদ্দীপন-বিভাব' হিসাবে অতুলনীয়া বনবালা শকুন্তলা ও মনোভিরাম অনুকূল পরিবেশ ও 'অনুভাব'-রূপে মহারাজ দুষ্মন্তের রতিভাবানুযায়ী অশ্রু, স্বেদ, রোমাঞ্চ এবং ব্যাভিচারী-ভাবরূপে অভিলাষ, আবেগ, গ্লানি, অসূয়া, বিতর্ক আদি ভাবের প্রকাশ—এ সকলই বাস্তবাশ্রয়ী বলে গেলেও ঠিক কোনো বাস্তব বস্তু বা ঘটনার সাক্ষাৎ-দর্শনের মতো মনে হয় না, বরং এগুলির ঐক্যতানে এক কল্পনার অপরূপে মায়া-জগৎ সৃষ্টি করে—যা বাস্তবের ছায়ারূপে তার মর্মসত্যটি বা মূল তত্ত্বগুলি রূপায়িত করতে চায়।

দেশ-কাল আশ্রয়ী এই বাস্তব-জগতের সেই মূলতত্ত্বগুলি বা সামান্যরূপে অমূর্ত ভাব-পদার্থগুলির বিশদ ও সম্যক আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং দার্শনিক

এই বাস্তব-জগৎকে পরিলক্ষণ, বিচার ও বিশ্লেষণ করেই সেই তত্ত্বগুলির ধারণামূলক জ্ঞান লাভ করেন। কবি বা শিল্পী তাঁদের বিশেষ প্রতিভাবলে এই তত্ত্বগুলি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতায় এবং প্রকাশ করেন এমন সব বস্তুর প্রতিরূপায়নের সাহায্যে—যেগুলি বাস্তবজগতে সেই তত্ত্বগুলির নিত্য অনুষঙ্গ এবং যাদের মানস-প্রত্যক্ষে ও প্রসঙ্গে সেই তত্ত্বগুলির অভ্যাস চিত্তে উদয় হয়।

শব্দ, অভিনয়, রেখা-রঙ, মূর্তি-গঠন বা ধ্বনি-সমাবেশের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পী প্রকাশ করতে চান কোনো-না-কোনো ভাবকে এবং এই ভাবটি এবং তাদের প্রকাশক উপকরণগুলি সবই কোনো বাস্তব ভাব ও তাদের প্রকাশক-সহকারীদের প্রতিনিধিস্বরূপ—ভাবশরীরী। এইই ভাবের ও বিভাব-অনুভাবের সাধারণীকৃতি। এই অবস্থার সেই ভাব ও তার সহকারী আনুষঙ্গিক বস্তুসকল লৌকিক ভাবে পাঠক বা দর্শককে স্পর্শ করে না। তাদের একপ্রকার রূপান্তর ঘটে। কাব্য ও শিল্পে বাস্তব-জগতেরই ঘটে এক রূপান্তর—যাকে অন্যভাবে সাধারণীকৃতি বলা যায়। এ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়োজন ভাব ও বস্তুসকলের বাহ্য সত্তা স্বীকার করা। সেই সঙ্গে রসেরও ঐরূপ একটি সত্তা স্বীকার করতে হয়। এইখানে অভিনবের সঙ্গে আমাদের কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য দেখা যায়।

রসের আস্বাদনের ব্যাপারটির এই ভাবের সামান্যরূপী বাহ্যসত্তার ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা হতে পারে। রসপ্রীতির মধ্যে একটি নিবিড় আত্মানুভূতির ভাবের কথা অভিনব বলেছেন (যা আমরাও স্বীকার করেছি)। অভিনবের ব্যাখ্যা-অনুসারে বিভাব-অনুভাবদ্বারা পরোক্ষভাবে কোনো ভাব উদ্বোধিত হয় তখনই যখন চিত্ত অতিশয় মননশীল এবং আত্মসচেতন অবস্থায় থাকে। লৌকিক ভাবোদ্রেকের ক্ষেত্রে চিত্ত জীবধর্মের তাগিদে ভাব-দ্বারা চালিত হয় এবং প্রয়োজন মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখন সে ভাবকে মনন বা উপভোগ করতে পারে না। কাব্য, নাটক বা অন্যান্য শিল্প-সম্ভোগের সময় চিত্তের এই অন্তর্মুখিতা সহজবোধ্য। কারণ এ ক্ষেত্রে সম্ভোগকারীর সম্মুখে কোনো বাস্তব-বস্তু থাকে না এবং যা থাকে তার কিছুটা থাকে মানসচক্ষে

আর কিছুটা মনন-সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়। বর্ণিত বা অনুকৃত বস্তু-সকলকে সক্রিয়ভাবে মানস-প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং তাদের অন্তর্নিহিত বা ব্যঞ্জিত অর্থ বা ভাবগুলিকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। এখানে বুদ্ধি শিক্ষা সহানুভূতি ও মননকার্যের তৎপরতা প্রয়োজন এবং এসবই কাব্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ লাভের জন্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে কাব্য বা শিল্পকলার কোনো ভাবালোচনার সময়ে রসজ্ঞ ব্যক্তি যে আপন রসসত্তা বা আনন্দস্বরূপের আস্বাদকেও লাভ করেন এবং সেই ভাবটির দ্বারা নিজের চৈতন্যকে উপরঞ্জিত মনে করবেন তা স্বাভাবিক। রসপ্রতীতি অন্যান্য সাধারণ প্রতীতির (যেমন—বস্তু, গুণ ইত্যাদি) তুলনায় অত্যধিক আত্মসচেতনাযুক্ত এ কথা আমরা স্বীকার করি এবং তার সুপ্রচুর ব্যাখ্যাও দিতে পারি কিন্তু তাই বলে 'রসপদার্থ' বলে কোনো বাহ্য-সত্তাকে অস্বীকার করার কারণ দেখি না। প্রতীতি হলে কোনো বাহ্যবস্তুর 'বিষয়'রূপে স্থিতি আবশ্যক—যার 'প্রতীতি হল' বলতে হয়। অভিনব এই প্রতীতি বা আস্বাদনের দিকটির উপর জোর যতটা দিয়েছেন—'বিষয়বস্তু'র উপর ততটা নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে কাব্য বা নাট্যে আমরা ভাবের বিশুদ্ধ জ্ঞান পাই না বরং পাই তার নিবিড় আত্মগত অনুভূতি—সুতরাং এ আমাদেরই চিত্তগত এক অভিব্যক্তি—এমন বলা যেতে পারে। এইরূপে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কাব্য-মীমাংসকদের মতবাদের সংশোধন করেন। কিন্তু এ কথাও স্বীকার না করলে চলে না যে এই ভাবকে আমরা যে অবস্থায় পাই—তাকে ঠিক আপনার বা পরের বলতেও বাধে।

ভাবের এই সাধারণীকৃতি ব্যাপারটির কথা আমরা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সাধারণীভূত ভাবের মনন বা বিভাবনে ভাবটির ঠিক তাত্ত্বিক জ্ঞান হয় না—অথচ ভাবটির উদ্রেকঘটিত লৌকিক পরিচয়ও হয় না। এই দুই সীমান্তবর্তী অবস্থার মাঝামাঝি একটি ক্ষেত্রের কল্পনা তাই অপরিহার্য। এই জন্যই সাহিত্য-কলায় 'ভাব-বিভাবন' ও তার ফলে রসপ্রতীতি—এই দুইটি ব্যাপারকেই 'অলৌকিক' বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে অভিনবের রস-ব্যাখ্যা মূলতঃ যথার্থ হলেও কিছুটা বিতর্কের

অবকাশ রাখে—কারণ তাঁর ব্যাখ্যার প্রবণতা কিছুটা বিজ্ঞানবাদী বা আত্মমুখী। এই দোষের কারণ তাঁর পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলির অতিরিক্ত বিষয়নিষ্ঠা।

ভট্টলোল্লটের মতে প্রকৃত নায়ক বা তার অনুকর্তা নটের উপর আরোপিত স্থায়ীভাবের অলৌকিক সাক্ষাৎকার রসের কারণ এবং শঙ্কুকের মতে নটনিষ্ঠ স্থায়ীভাবের অনুমান এর কারণ। এই দুই ক্ষেত্রেই স্থায়ীভাবে জ্ঞানমূলক পরিচয় ঘটে এবং এর দ্বারা রসোদ্বোধের ব্যাখ্যা সম্ভব নয় কারণ এই বোধের একটি আন্তরিকতা আছে যা নিছক জ্ঞানধর্মী নয়। ভট্টনায়ক এই দিকটির প্রতি ন্যায়াচরণ করতে চাইলেন তাঁর 'ভোগীকৃতি'র ধারণাটির সাহায্যে। কিন্তু এইটির সবিশেষ ব্যাখ্যা না দিয়ে এটি চিত্তের একটি ধর্ম বলেই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে যার চিত্তে কোনো একটি ভাবের কোনোই সংস্কার নেই—তার সেই ভাবপ্রকাশক কাব্য বা নাটকপাঠে বা দর্শনে তেমন রসোদ্বোধ হবে কি? অভিনব বললেন 'হবে না'। এবং বাস্তবিকপক্ষে যে সকলেরই সবরকম রসোদ্বোধ অল্পবিস্তর ঘটিত হয় তার কারণ হিসেবে বললেন: 'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার বিদ্যমান এবং আমরা ইতিপূর্বে নানা বিচিত্র জীবন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছি'। সুতরাং অভিনব-দর্শনে রসোদ্বোধ হয় নিজেরই অন্তরের সুপ্তভাবের প্রকাশে এবং আস্বাদনে। কিন্তু এখানে যেমন তিনি যথার্থই ভট্টনায়কের মতটির সংশোধন করেছেন বলতে হবে তেমন এ কথাও বলতে হবে যে তিনি একটু অন্যদিকে এগিয়ে গেছেন। সাহিত্য-শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভাবের সাধারণীকৃতি হয় তা ভট্টনায়ক ও অভিনব দুজনেই স্বীকার করেন। এখন সাধারণীভূত ভাবটি যেরূপে রসিকচিত্তে গৃহীত হয় এবং যাকে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্তভাবে বিভাবিত বা মননীকৃত বলা হয় এবং যা লৌকিক ভাবসম্ভোগ থেকে বিলক্ষণ—তার প্রতি লক্ষ রাখলে ভাবটিকে ঠিক রসিকচিত্তের আত্মগত বা পরগত কিছুই বলা যায় না। ভাবটিকে আশ্রয়হীন ভাসমান বিজ্ঞান-পদার্থমাত্র বলা যায়। এ হেন ভাবের অনুভূতিকে একান্ত আত্মগত বা

দর্শনে বা যোগধ্যানে প্রাপ্য ভাবের তাত্ত্বিক জ্ঞান কোনোটিই বলা যায় না। এই ভাবানুভূতিকে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। ভাবের শৈল্পিক বা সৌন্দর্যগত উপলব্ধি বলা যেতে পাবে। মোটকথা, অভিনবের রসব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা স্বীকার করেও আমাদের তার কিছুটা বিচার ও সংশোধনের অবকাশ রাখতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

।। কাব্যে ভাব প্রকাশ ।।

কাব্যে ভাব-প্রকাশের উপায় ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন-ব্যাপার।

প্রথম কথা : কাব্যের প্রকৃতি-নির্ণয়ে আমরা কাব্য-জনিত বিশেষ ধরণের আনন্দ-তত্ত্বটি এবং তার মূলে বিশেষ প্রকারের ভাব-প্রকাশ ব্যাপারটির অবতারণা ও আলোচনা পূর্ব-প্রবন্ধে করেছি[1]। এই ভাব-প্রকাশ ব্যাপারটির প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে হলে—তার মূলে যে-তত্ত্বটি কাজ করে সেইটিকে বুঝতে হবে। সেইটি হল 'ব্যঞ্জনা' বা 'ধ্বনন-ব্যাপার'। এর কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্বেই উল্লেখ করা গেছে। এখন বিশদ পরিচয় দিতে হলে প্রথমেই কাব্যের অন্যান্য প্রকারের অর্থ থেকে তার ব্যঞ্জনার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থকে পৃথক করে বুঝতে হবে[2]। শব্দের বাচ্যার্থ বলতে আমরা তার অভিধেয় অর্থটিকে বুঝি যা শব্দ-প্রয়োগের চলিত রীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইটিকে শব্দের মুখ্যার্থ বা প্রাথমিক অর্থ বলা যায় এবং শব্দের এই অর্থ-জ্ঞাপনের শক্তি বা ব্যাপারটিকে 'অভিধা' বলা যায়। কোনও বিশেষ পরিবেশে একটি শব্দের এমন একটি অর্থ প্রকাশিত হয় যাহা তার বাচ্যার্থের বিরুদ্ধ। যেমন আমার বাড়ীটি গঙ্গার ওপর' এখানে 'ওপর' শব্দের যে অর্থটি গ্রহণযোগ্য তাহল 'খুব কাছে' এবং 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ 'গঙ্গাতীর' মনে করতে হয়।

শব্দের এই অর্থটিকে 'লক্ষ্যার্থ' এবং শব্দ-ব্যঞ্জনা ব্যাপারটিকে 'লক্ষণা' বলা হয়। আমরা একে শব্দের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ বলতে পারি। এই

১. অভিনব ভারতী : পৃঃ ২৮০

২. ঐ পৃঃ ২৮৪, ২৯১, ২৯৩ (ধ্বন্যালোক—লোচন—পৃঃ ৫১, ৪৫)

প্রকার অর্থ ও শব্দ-ব্যঞ্জনা দুই-ই ভাব-প্রকাশ-দ্বারা নির্ধারিত। 'আমার বাড়ীটি গঙ্গার ওপর' এই বাক্য ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ব প্রসঙ্গ অনুসারে এমন অর্থ প্রকাশ করে, যেমন 'আমি গঙ্গার শোভা ও শীতল বায়ু উপভোগ করি।' এ ক্ষেত্রে 'গঙ্গা' বা 'ওপর' শব্দেব লক্ষ্যার্থ-বোধের অতিরিক্ত একটি অর্থবোধ হয়। এটিকে ব্যঞ্জনার্থ ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনিত অর্থ অথবা সংক্ষেপে 'ধ্বনি' বলা হয়। এইটি হল তৃতীয় প্রকারের অর্থ যে শক্তি বা ব্যাপারের দ্বারা এটির সংঘটন হয় তাকেই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন-শক্তি বা ধ্বনন ব্যাপার বলে। শব্দার্থ-বোধের এই ব্যাপারটি যে লক্ষণা থেকে বিলক্ষণ তার প্রধান প্রমাণ হল এই যে লক্ষ্যার্থ প্রকাশ হয় যখন শব্দের বাচ্যার্থ 'বাধিত' ও 'নিরোধিত' হয়। কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে ধ্বনিত হয় প্রকাশিত অর্থ, এই বাচ্যার্থের মাধ্যমেই। দৃষ্টান্ত: 'ভয় আমি জানিনে,—আমি ভীমসেন।' কিংবা 'তাঁর জীবনটির কথা স্মরণ করলে বলতে হয় হ্যাঁ, তিনি মানুষ ছিলেন।'—এখানে 'ভীমসেন' ও 'মানুষ' শব্দের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়—যে ব্যঞ্জনায় তাদের মুখ্যার্থ-বোধ অন্তর্হিত হয় না, বরং তার সাহায্যেই সম্ভব হয়। এই ধ্বনি যে মুখ্যার্থেরই প্রকার-বিশেষ বা প্রসারিত রূপ নয় বরং একটি স্বতন্ত্র শক্তি বা ব্যাপার তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়: **প্রথমতঃ** কোনও শব্দ ও তার মুখ্যার্থের মধ্যে কোনও মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। শব্দ সরাসরি ভাবে অর্থের বোধ জন্মায়, কিন্তু কোনও শব্দ এবং তার ব্যঞ্জনার্থের মধ্যে প্রয়োজন হয় শব্দের মুখ্যার্থের মধ্যস্থতা বা ঘটকতা। এই জন্য কোনও শব্দের মুখ্যার্থ-বোধ ও তার ব্যঞ্জনার্থ-বোধ এই দুইয়ের একটি ক্রম বা কালভেদ থাকে। এই ক্রম অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়—যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই ক্রমটি ধরা নাও পড়তে পারে এমনই তড়িৎ গতিতে শব্দের মুখ্যার্থবোধ হতে ব্যঞ্জনার্থটির বোধ শেষ হয়।

এইখানে স্বাভাবিকভাবেই এক প্রশ্ন উঠতে পারে যে—তাহলে এই ব্যঞ্জনার্থটিকে মুখ্যার্থের অর্থ না বলে শব্দটির অর্থ কেন বলব? এর উত্তরে বলা যায় যে সেই শব্দটির কার্যকারিতা তার মুখ্যার্থের দ্যোতনা করেই শেষ হয়ে যায় না বরং ব্যঞ্জনার্থটির দ্যোতনার জন্য এই শব্দটি এবং

তার মুখ্যার্থটি-উভয়েরই উপযোগিতা অনুভবসিদ্ধ। এই জন্য যদিও ব্যঞ্জনার্থটি শব্দের একটি স্বতন্ত্র অর্থ-বোধক শক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়—তথাপি এই অর্থটিকে সেই শব্দটিরই একটি ভিন্ন অর্থ বলতে হয় এবং একে তার মুখ্যার্থের অর্থ বলা ঠিক হবে না।

কিন্তু এইখানে আপত্তি হতে পারে যে শব্দটির যদি দুইটি অর্থ হয় তাহলে কোনটিকে গ্রহণ করব? এক্ষেত্রে শব্দের অর্থ গ্রহণে বাধা ও গণ্ড-গোলের সৃষ্টি হবে না কি? উত্তরে বলা চলে যে, এই দুইটি অর্থের মধ্যে কখনও একটির এবং কখনও অপরটির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং সাধারণতঃ এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ বা ভ্রমের অবকাশ বিশেষ থাকে না। যেমন:

'আর নাই রে বেলা, নামলো ছায়া ধরণীতে।
এখন চল্‌রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।'

(গীতবিতান)

কিংবা:

'দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী,
আর বেয়ে কাজ নেই তরণী।'

(দিনশেষে, চিত্রা)

এখানে দিনশেষের একখানি শান্ত ভাবের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তার মুখ্যার্থটিই প্রধান। ব্যঞ্জনার্থটি সেই প্রধান অর্থটিকেই চারুত্ব-দান করছে।

কিন্তু:

'দিন যদি হলো অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দিরপ্রাঙ্গণে
ওই তব এলো আহ্বান।'

(গীতবিতান)

অথবা:

'সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে!'

এইখানে 'দিনশেষে'র ব্যঞ্জনার্থের সহিত কাব্যার্থের সার্থক সমন্বয়।

অভিনব এবং পরবর্তী কাব্য-মীমাংসকগণের মতে সার্থক কাব্যে ব্যঞ্জনার্থের প্রাধান্য ও অন্যান অর্থের গৌণত্ব থাকা প্রয়োজন এবং কাব্যার্থটি এই ব্যঞ্জনার্থের প্রতিফলিত দ্যোতনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা এবং নিরপেক্ষ মীমাংসা অনুসারে আমাদের মতে যেখানে এই দুই অর্থই সমান প্রাধান্য লাভ করেছে এবং দুইয়েরই একটি অদ্ভুত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় পরিলক্ষিত করা গিয়েছে—সেইখানে কাব্য-রসের একটি বিশেষ রূপ পাওয়া যায় আর সেইখানে শব্দ সাধারণ অর্থেই দ্ব্যর্থক এবং মনোহারী হয়ে ওঠে। এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দপ্রয়োগ যে কাব্যে থাকে—তাকে আমরা শ্রেষ্ঠ না বললেও অসার্থক বলতে পারি না। যদিও অভিনব এবং অন্যান্য কাব্য-মীমাংসকদের মতে—যেহেতু ওই কাব্যে শব্দ ও অর্থ নিজ নিজ প্রাধান্যকে ত্যাগ করে ব্যঞ্জনার্থকে সুপ্রকাশ করেনি—সেই হেতু ওইসব কাব্য 'ধ্বনি কাব্য' হয়নি[3] এবং সেজন্য তাতে 'কাব্যের আত্মা'ই বাদ পড়ে গেছে[4]।

আমাদের বক্তব্য সহজ-বোধ্য করতে দুই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এইখানে উপস্থিত করা যায়:

যথা:

'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।'

(গীতবিতান)

আবার:

'জানি গো, দিন যাবে এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলা শেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে।'

(গীতবিতান)

৩. অভিনব ভারতী: পৃঃ ২৮০, ২৮৫ (ধ্বন্যালোক লোচন ১, ৪)
৪. অভিনব ভারতী: পৃঃ ২৮৬, ২৯১ (ধ্বন্যালোক লোচন পৃঃ ৫১)

এসব ক্ষেত্রে 'সন্ধ্যা' অর্থে আমরা 'দিবা-অবসান' এবং 'জীবনাবসান' দুইয়েরই বোধ সমান মাত্রায় লাভ করি এবং এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করব আর কোনটিকে দূরে ঠেলে দেব—এ প্রশ্ন উদয় হয় না। বরং ঐ উভয় অর্থেরই এক দ্বন্দ্বাত্মক সমন্বয়ে একটি অপূর্ব সুষমাযুক্ত অতি সমৃদ্ধ অর্থের দ্যোতনায় কাব্যাংশটি সার্থকভাবে মনকে অভিভূত করে দেয়।

ধ্বনিত অর্থ যে শব্দের বাচ্যার্থ হতে ভিন্ন—এবং এইজন্য শব্দের ব্যঞ্জনা-ব্যাপারটি যে তার অভিধা হতে পৃথক—তার দ্বিতীয় প্রমাণ-স্বরূপ বলা চলে যে শব্দের অভিধাদ্বারা কোনও ভাবের দ্যোতনা হয় না কিন্তু শব্দটির ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের সাহায্যে তা সম্ভব হয়। 'রতি', 'ভয়' 'উৎসাহ', 'লজ্জা', 'গ্লানি'-আদির সরাসরি শাব্দিক সংকেত দ্বারা সেই ভাবগুলির একপ্রকার পূর্ব-জ্ঞান চিত্তে উদয় হয়। —যেমন 'মানুষ' বা 'কলম' বললেই ঐ ঐ বস্তু-বিষয়ে অবহিত হই। কিন্তু যখন উপযুক্ত শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ প্রসঙ্গে কবি এইরকম একটি ভাবকে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত করেন—তখন সেই শব্দের ব্যঞ্জনার্থ রূপেই ঐ ভাবটির দ্যোতনা হৃদয়ে জাগরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সাধারণীভূত রস-রূপের আস্বাদন মনকে অভিভূত করে। সে ক্ষেত্রে ঐ শব্দটির বাচ্যার্থ মূল ভাবটিরই যেন জীবন্ত বিগ্রহ অথবা প্রতিভূ হয়ে থাকে। শেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথ যখন বলেন :—'নিভে যাও—নিভে যাও, ক্ষণস্থায়ী বাতি।' কিংবা ক্লিওপেট্রা যখন বলেন : 'স্বামী! আমি আসছি!' —তখন 'বাতি' ও 'স্বামী' শব্দটির ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা সুদূরপ্রসারী এবং রসঘন। রবীন্দ্রনাথের-'হে মহিমাময়ী মোরে করেছ সম্রাট'—('প্রেমের অভিষেক' কবিতায়) এখানে 'মহিমাময়ী' ও 'সম্রাট' অনুরূপ। আবার—('বিদায়-অভিশাপ' কবিতায়) 'আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।' এখানে 'দেবী' শব্দটির ব্যঞ্জনা স্মরণীয়। আবার :—'আমার এ আঁখি. উৎসুক পাখী, ঝড়ের অন্ধকারে।' (গীতবিতান)। পুনশ্চ :

—'এই বাসা ছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।

(বলাকা)

উভয় স্থলেই 'পাখী' শব্দটির ব্যঞ্জনা অসীম ভাবপূর্ণ ও গভীর।

এই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন-ব্যাপারটি যে 'অভিধা' হতে ভিন্ন তার তৃতীয় প্রমাণ-স্বরূপ বলা যায় যে দ্বিতীয়টি নির্ভর করে শব্দ-ব্যবহারের প্রচলিত রীতির ওপর। কিন্তু প্রথমটি নির্ভর করে প্রসঙ্গেরও পরে—অর্থাৎ অন্যান্য শব্দ ও তাদের বাচ্যার্থ,—বক্তা ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থান-কালের ওপর। আবার পাঠকের বা শ্রোতার অভিধার বোধ ঘটে সাধারণ শব্দার্থ জ্ঞান থাকলেই,—কিন্তু ব্যঞ্জনা-বোধের জন্য পাঠক বা শ্রোতার আরও কিছু বেশী ক্ষমতার প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ সংবেদনশীল মানসিকতা, প্রখর বুদ্ধি. বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, জীবন দর্শন এবং সহৃদয়তা।

এখন শব্দের এক চতুর্থ প্রকারের অর্থকারী শক্তি আছে। তাকে 'তাৎপর্য-শক্তি' বলে। কয়েকটি শব্দের সমাবেশে একটি বাক্য হয় এবং শব্দগুলির পাঠ বা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই বাক্যটির বোধ অনুভূত হয়। এখন এই বাক্যার্থটি শব্দের বাচ্যার্থের মতনই শব্দ-প্রয়োগের প্রচলিত রীতি-নির্ভর এক সরল-বোধ্য বস্তু হতে পারে—আবার ব্যঞ্জনার্থের মতোও হ'তে পারে। ব্যঞ্জনার্থটি বাচ্যার্থকে নিরোধ করেও প্রকাশ পেতে পারে আবার তাকে আশ্রয় করেও হতে পারে। প্রথমটির দৃষ্টান্ত :

—'তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!'

(দুই বিঘা জমি)

দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ :

—'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—'

(দুঃসময়)

অথবা : —'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা!

(দুঃসময়)

আবার : —'বাজুক কাঁকন তোমার হাতে
আমার গানের তালের সাথে!'

(গীতবিতান)

কিংবা ঃ

যেতে দাও গেলো যারা,—তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না'

(গীতবিতান)

আলোচনাকারীদের অনেকে বলেন যে এইসব ক্ষেত্রে বাক্যের ব্যঞ্জনা-ব্যাপারটি তার শব্দগুলির তাৎপর্য-ব্যাপারটিরই সম্প্রসারিত আকার মাত্র। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে তাৎপর্য-বোধের বেলায় শব্দগুলির ব্যঞ্জনার্থ বা ভাব-দ্যোতনা প্রস্ফুটনের যথার্থ অবকাশের অভাবে গোড়াতেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। শব্দের বিবৃতি বা তাৎপর্য-বোধ তখন কেবলমাত্র উপায়-হিসাবেই চিত্তে স্থান পায়। আর ব্যঞ্জনা-ব্যপারটির মাধ্যমে শব্দ-গ্রন্থনা কেবলমাত্র উপায় হিসাবেই চিত্তে স্থান পায় না বরং এক্ষেত্রে উপায় ও—উপায়ন—সাধন ও সাধ্য তুল্য-মূল্য। উপরন্তু,—ব্যঞ্জনার্থ ভাব-বিশেষকে 'সহৃদয়'-চিত্তে দ্যোতিত করে, কেবলমাত্র কোনও বিবৃতিদানে অথবা বিধি-নিষেধ-আরোপনেই তার অর্থবহতা সীমিত নয়। শব্দের তাৎপর্য-শক্তি দ্বারা এইরূপ ভাব-প্রযোজনা সম্ভব নয় বরং সমাচার বা আদেশ-জ্ঞাপন সম্ভব। আবার তাৎপর্য-শক্তি নির্ভর করে শব্দ-ব্যবহারের আভিধানিক নিয়মের ওপর কিন্তু ব্যঞ্জনা-শক্তি নির্ভর করে আরও কয়েকটি বস্তু, বা ব্যাপারের ওপরে ; যথা প্রসঙ্গ এবং পাঠক বা শ্রোতার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও রস-বোধের ওপর।

এস্থলে একাধিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে এই ব্যঞ্জনা-ব্যপারটি কি অনুমানের ব্যাপার? শব্দের মুখ্যার্থ থেকে কি তার ব্যঞ্জনার্থটি অনুমিত হয়—যেমন ধোঁয়া হতে হয় আগুনের অনুমান? এর উত্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায়—না, তা নয়। কারণ, এই আলোচনাতে যেমন পূর্বেই আমরা দেখেছি যে ব্যঞ্জনা-ব্যাপারটি দ্বারা আমরা কেবল ভাব-সম্বন্ধে অবহিতই হইনে—পরন্তু, একই সঙ্গে লাভ করি তার নিবিড় আস্বাদন। তাছাড়া ব্যঞ্জনার্থটি কোনও সুনির্দিষ্ট বিধি-নিয়মানুসারে কোনও সুনির্দিষ্ট বিষয়-বস্তুর জ্ঞান-দান করে না,—বরং, স্থান-কাল, পাত্র ও প্রসঙ্গ এবং পাঠক বা শ্রোতার দক্ষতার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়ে এটি যে

বিশেষ ভাবের দ্যোতনা করে—সে-ভাবটির কোনও স্থিরীকৃত রূপ-রেখা-সংগঠন বা ধারণা-মূলক পরিচয় দেওয়া চলে না, কারণ তা অনুমেয়-বস্তুর ন্যায় যে সকল ক্ষেত্রেই একেবারে একই বস্তু হবে—তার কোন কথা নেই। যদিও একটি কাব্য-পাঠ দ্বারা দুইজন পাঠক মোটামুটি একই ভাবের রসাস্বাদন করে থাকে। তবু কয়েকজন পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, রস-বোধ, ব্যক্তিত্ব এবং 'সহৃদয়'তার পার্থক্য-হেতু বিভিন্ন চিত্তে চিত্রায়িত ভাবের মধ্যে অনেকখানি মিলের সঙ্গে সঙ্গে বহু পার্থক্যও ঘটে। একজনের মনে কাব্যের বর্ণিত অংশ ও তার উহ্য প্রসঙ্গের কতক ব্যঞ্জনা যেমনভাবে রেখাপাত করবে—অন্যজনের মনে তা নাও করতে পারে। অবশ্য সহৃদয় পাঠক-মাত্রেই কবির হৃদয়-গত ভাবটিকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে যত্নবান হবেন। কিন্তু যেহেতু এই 'হৃদয়-সংবাদ' ব্যাপারটি অনুমান-জ্ঞানের মতো কেবল বুদ্ধিমূলক নয়—বরং রুচি, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি এবং সংবেদনশীলতার অপেক্ষা রাখে—সেই হেতু কাব্যের 'ভাব-গ্রহণ' ব্যাপারটিতে কিঞ্চিৎ আত্মমুখিতা ও আপেক্ষিকতা (Subjectivity and Relativity) থাকে। সুতরাং দেখা গেল যে কাব্যের ব্যঞ্জনার্থটি—যেটি কাব্যের প্রধান অর্থ—অনুমানের বিষয় নয়। অবশ্য কোনও কবি-রচিত রসাত্মক কাব্য অপরের রসোদ্বোধের উন্মেষে সহায়ক—এই প্রয়োজনের তথ্যটি এবং কোনও পাঠক-দ্বারা গৃহীত ব্যঞ্জনার্থটি যথার্থ হয়েছে কিনা তার বিচারও অনুমান-সাহায্যেই হবে। কিন্তু এই দুইটি ব্যাপার ভাব-ব্যঞ্জনা বা রস-প্রতীতি হ'তে ভিন্ন।

এখন সহজ মীমাংসাটি চোখে পড়ে যে, শব্দের এই দ্বিতীয় এবং চতুর্থ প্রকারের অর্থকারিতার ফলে তার বাচ্যার্থ (Literal) এবং তার তৃতীয় প্রকার অর্থকারিতার ফলে ব্যঞ্জনার্থটিকে (Suggested meaning) পাওয়া যায়। কাব্যের এই বাচ্যার্থটিকে আশ্রয় করেই এবং তাকে অতিক্রম করে (কখনও বা তাকে নিরোধ দ্বারা) ব্যঞ্জনার্থটি প্রকাশমান হয়। কাব্যের শব্দসঞ্চয় ও সেগুলির বাচ্যার্থ কাব্যের শরীর সংগঠন করে এবং তারই মধ্যে নিহিত ও প্রস্ফুটিত অথচ তার থেকে ভিন্ন ও সূক্ষ্মতর এই ভাবের দ্যোতনা

যেন মানুষের দেহ-সৌন্দর্য-বৃন্তে লাবণ্যটুকুর মতোই অধরা। কাব্যের ব্যঞ্জনার্থটুকু যেন রূপের মধ্যে শ্রীর মতো ফুটে ওঠে শব্দমালার সার্থক গ্রন্থনে[৫]। আর সেই জন্যই কবিকে রসের তাগিদে শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জনার দিকে অর্থাৎ 'কথা-বস্তুর' প্রতি যত্নবান হতে হয় দীপ-শিখা জ্বালতে আলোক প্রার্থীর মতো। রসই কাব্যের অন্তর-তম তত্ত্ব। 'রসাস্বাদ'ই কাব্য-চর্চায় অমৃত প্রাপ্তি। কাব্য সৃষ্টি কবির রসানুভূতিরই ইতিহাস।

—যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষা বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা
তথা মূলং রসাঃ সর্বেতেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ। (নাট্যশাস্ত্র)

৫. অভিনব ভারতী : পৃঃ ২৮৬

চতুর্থ অধ্যায়

দুঃখ-মূলক নাটকের সৌন্দর্য

কোনও দুঃখমূলক নাটক (Tragedy) দেখতে আমরা ভালোবাসি এবং তার একটি সৌন্দর্য আছে বলে স্বীকার করি। বস্তুতঃ 'ট্র্যাজেডি' ললিত-কলাগুলির মধ্যে একটি মনোরম কলা এবং সাহিত্য-কলার মধ্যে তার স্থান অনেকের মতে সর্বোচ্চে। তবে এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'ট্র্যাজেডির মধ্যে সৌন্দর্য কোথা হতে আসে।' প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিষ্টটল্‌ই সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে ট্র্যাজেডির সৌন্দর্য তার বিষয়-বস্তুতেই বেশী মাত্রায় নিবদ্ধ এবং তা আধার বা বহিরাবণে অল্প। নাটকের আধার-অর্থে এখানে তার ঘটনা-বিন্যাস ও ভাষা-চাতুরীই বোঝায় এবং যদি এই ঘটনা-বিন্যাস (বা plot-এ) বেশ পরিপাট্য ও সামঞ্জস্য থাকে এবং ভাষাও ভাবোপযুক্ত হয় তাহলে বলতে হবে যে নাটকের আধার (অথবা আঙ্গিক বা রচনা-কৌশল) সুন্দর হয়েছে। কিন্তু ট্র্যাজেডির যথার্থ ও মুখ্য সৌন্দর্যের উৎস হল তার বিষয়-বস্তু (এবং এখানে বিবেচ্য বিষয-বস্তুটি কি)। অ্যারিষ্টটলের মতে ইহা দুইটি আবেগের সমষ্টিমাত্র এবং ঐ আবেগ দুইটি হল 'ভয়' ও 'করুণা'। ভয়ও করুণাই দুঃখ-মূলক নাটকের মূল-ভাব। নাটকীয ঘটনা-সমাবেশ হতে এই ভাব-ব্যঞ্জনার উত্তম ও সার্থক প্রকাশ সহৃদয় দর্শক, শ্রোতা ও পাঠকের প্রাণে সঞ্চারিত হলেই নাটকের সফলতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এখানে আর এক প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'ভয় ও করুণা' হতে আমরা আনন্দ আহরণ করি কি প্রকারে—কারণ বাস্তব জীবনে ঐ ভাব দুটিকে তো নিরানন্দ বলেই জানা যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে অ্যারিষ্টটল বলেন নাটকে ঐ ভাবগুলির পরিশোধন ঘটে এবং আমরা ঐ ভাবগুলি হতে একপ্রকার মুক্তি পাই। এই প্রসঙ্গে

অ্যারিস্টটল ক্যাথারসিস (Catharsis) শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং Catharsis কি করে সম্ভব হয় এই কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন (যেমন মহাকবি মিল্টন) যে নাটক-দর্শনের সময় (বা শ্রবণ-পঠনের সময়ে) দর্শকের (বা শ্রোতা বা পাঠকের) হৃদয়ে এই ভাবগুলির উগ্রতা বা আধিক্য হ্রাস পায় (বিশেষ দু-একজন ব্যতিক্রম) এবং দর্শক-হৃদয় হতে তার একপ্রকার 'বহিংকার' ঘটে। কিন্তু এই মতবাদে আমাদের মন ভরে না—কারণ দর্শকের (বা শ্রোতা ও পাঠকের) হৃদয়ে আগে হতে এই ভাবের সঞ্চার হয় না—নাটক দেখার সময়ে দর্শক-হৃদয়ে ঐ ভাবের সঞ্চার ঘটে এবং ঐ ভাব পূর্ব হতেই দর্শক-হৃদয়কে তো পীড়া দেয় না যে নাটক দেখা তার 'বহিষ্কার' ঘটাতে হবে। একথার উত্তরে অনেকে বলেন ঐ ভাবগুলি দর্শক-হৃদয়ে পূর্ব হতে সঞ্চারিত হয় না বটে কিন্তু স্বভাবত আমরা চাই কিছুক্ষণের জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য এবং তারপর একটি শান্ত সমাহিত ভাব। এইরূপ 'ঝড় আর প্রশান্তি' আমাদের হৃদয়ে বহন করতে ট্র্যাজেডি সমর্থ হয় এবং তাই আমরা 'দুঃখ-মূলক নাটক' (Tragedy) ভালবাসি। এ প্রসঙ্গে এও বলা হয় যে ট্র্যাজেডি আমাদের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করেই ক্ষান্ত হয় না—উপরন্তু যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করি 'ইহ-জীবন ক্ষণিক মায়ামাত্র—বাস্তবিক মূল্য এর কিছুই নেই'। বা 'নিয়তির চক্র কেহই এড়াতে পারে না'···ইত্যাদি। তখন আমরা আর একপ্রকার শান্ত গভীর রসের আস্বাদন পাই। সুতরাং ট্র্যাজেডিতে ভীতি ও করুণার ভাবগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। যথা—সমুদ্রের শান্ত রূপটি অনুভব করতে হলে তার পূর্বেই সমুদ্রের উত্তাল রুদ্র মূর্তিটি দেখার অনুভূতিটি চাই,—তেমনই ট্র্যাজেডির যথার্থ রসটি লাভ করতে হলে তার দুঃখ আর অশান্তিকে ভয় করে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। তাই স্বভাবতঃই আমরা তাও ভালবাসি। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে ভয় ও করুণার ভাবের প্রভাব হতে শুধু আমরা একপ্রকার মুক্তিই পাই না—উপরন্তু, ঐ ভাবগুলিকে পরিশোধিত ও উন্নতরূপে দেখতে পাই। সাধারণতঃ জীবনে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের করুণার উদ্রেক তখনই হয় যখন আমরা কল্পনায় অপরের কাহারও বিপদ-সংকুল অবস্থা দেখে অভিভূত হয়ে

ভয় পাই আর মনে মনে বলি 'আহাঃ ! ও কি কষ্টে আছে !' আবার মনে মনে এ-ভাবনাও আসে 'আমার যেন ওরকমটি না হয় !' সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'করুণার' মূলে আছে 'ভয়'। এবং এই ভয়টি নিজের জন্য। অর্থাৎ ইহা নিঃস্বার্থ নয়—স্বার্থমূলক। তবে নাটকে আমরা যে 'ভয়টি' পাই তাহা নিঃস্বার্থই বলতে হবে। নাটকের নায়ক যে সত্যকার মানুষ নয় এবং তার দুঃখ যে সবখানিই কল্পিত তাহা আমরা বেশ ভালই অবহিত থাকি। শুধু ভয় করতে ভাল লাগে বলেই ভয় করি। যেমন ঝমাঝম বর্ষা-রাতের আবছা আঁধারে ভূতের গল্প শুনে ভয় করতেই লাগে ভাল। তাহলে বলা চলে যে ট্র্যাজেডি আমাদের ভয় ও করুণাকে তাদের স্বার্থবহতার দোষ হতে নিষ্কৃতি দিয়ে এই প্রকারে পরিশোধন করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ট্র্যাজেডি দেখে আমাদের হৃদয়ে যে ভীতি ও করুণার সঞ্চার হয়, তাহা বাস্তব-জীবনের ভীতি ও করুণার মত প্রত্যক্ষ (এবং প্রত্যক্ষ বলেই আত্মগত ও কষ্টকর) নয়। এক্ষেত্রে আমরা ঠিক ভয় পাই না ভয়কে 'মনন' করি—ভয় পেলে কেমন হয় তাই দেখি। আমরা তখন করুণায় গলে পড়ি না (বিশেষ দু একজন ছাড়া)—বরং করুণার ভাবটিকে সামনে রেখে আস্বাদ করি। সুতরাং ঐ ভাবগুলিদ্বারা আমরা তেমনভাবে প্রভাবান্বিত হই না—যেমনটা আমরা বাস্তব-জীবনে হয়ে থাকি। উপরন্তু, ঐ ভাবগুলিকে ভাল করে চিনতে পারি —জানতে পারি এবং সেইটেই আমাদের আনন্দলাভের কারণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য দর্শনেও আমরা এই কথাটি পাই। তিনি বলেন 'দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে—আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে; সেই ভূমৈব সুখং …(সাহিত্যের পথে, ভূমিকা, পৃঃ IV)।

এখন আমাদের দেখতে হবে ট্র্যাজেডির এই ভাবগুলি কিভাবে উৎপন্ন বা সঞ্চার করা হয়। সেজন্য আমাদের 'নায়কের' মনোনিবেশ করতে হবে—কারণ নাটকের নায়ক ব্যক্তিটি কেমন এবং তিনি কি করেন না করেন বা তার ভাব-ভাবনা, ভোগ-ত্যাগ কি প্রকার,—অর্থাৎ তার চরিত্র ও ভাগ্যই হল নাটকের মধ্যে প্রথম দেখবার বিষয়। এবং তা হতে নাটকের মূল

রসটি কেমন হবে বোঝা সহজ হবে। দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেন নায়ক হবেন একজন মধ্যম ধরনের ব্যক্তি—যিনি খুব সাধু প্রকৃতিরও নন বা খুব অসাধু অসৎও নন আর তাঁর দুর্ভাগ্য এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁরই বিচারের বা সিদ্ধান্তের কোনও একটি ভুলে। তিনি কোনও ইচ্ছাকৃত পাপের জন্য উঁচু হতে নীচে পতিত হবেন না। এইখানে প্রথমেই আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হবে যে—ট্র্যাজেডির নায়ক এমন মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তি কেন হবেন? উত্তরে বলা যায়—নায়ক যদি একেবারে সাধু-প্রকৃতির হন তাহলে তাঁর দুর্ভাগ্য দেখে আমরা কষ্টই পাব এবং তা আদৌ ভাল লাগবে না। আর যদি তাঁকে কোনও দুর্ভাগ্য ভোগ না করতে হয় তো—তাহলেও আমরা ট্র্যাজেডির বিশেষ রসটির (ভীতি ও করুণা) সন্ধান পাব না। আবার যদি নায়ক খুবই অসাধু প্রকৃতির হন তো—তাহলে তাঁর পতন আমাদের মনে আনন্দেরই সৃষ্টি করবে—ভীতি বা করুণার সঞ্চার করতে পারবে না। আবার যদি তাঁর পতন না ঘটে আমরা ভীত হয়ে পড়ব ('এই ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার সঞ্চারও কষ্টকর) আমাদের মনে ঈপ্সিত করুণা জাগবে না। তাছাড়া নায়ক যেমন মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তি হবেন দর্শকগণেরও (বা শ্রোতা বা পাঠকবর্গের) অধিকাংশই সেই শ্রেণীভুক্ত। এজন্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে ভয় ও করুণা দ্রুত সঞ্চারী হবে কেননা তারা নিজেদের নায়কের ভূমিকায় অনুভব করবে এবং এ-দেখা তখনই সহজ হবে—যখন 'নায়ক' ও 'দর্শক' একই শ্রেণীভুক্ত সহমর্মে ও সমবোধে। সমবেদনা তখনই জাগ্রত হয় যখন দেখি আমাদেরই মতন একজন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তখন স্বতঃই মনে হয় 'আমিও ঐ অবস্থায় পড়তে পারতেম।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ্যারিস্টটলের নায়ক সম্বন্ধে অনুশাসন যুক্তিসঙ্গত।

এখানে আর এক কথার উদয় হতে পারে যে তাহলে কি ট্র্যাজেডিতে নায়কের প্রতি যথার্থ সুবিচার হবে না বা তিনি ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ পাবেননা—নিয়তিই প্রবল হবে? হাঁ, তাই হবে। এ্যারিস্টটলেরও এই অভিমত। তিনি বলেন—নায়ক একটু ভুলের জন্য অনেক শাস্তি পাবেন—তাঁর পতনও ঠিক ন্যায়-দন্ডানুযায়ী হবে না। একটি ছোট্ট ভুল বুননের

জন্য তাঁর জীবন-ব্যাপী সমস্ত কারুকার্যই ব্যর্থ হবে যাবে। এই ব্যর্থতার বোধ হতেই ট্র্যাজেডির রস জন্মে। অনেক আধুনিক সমালোচক এই ব্যর্থতা-বোধকেই ট্র্যাজেডির মূল-ভাব বলেন। একজন বলেন : ট্র্যাজেডিতে আমরা দেখি নায়ক তাঁর আবেষ্টনীর সঙ্গে সর্বদাই যুদ্ধ করছেন তবু শেষে হার তাঁরই ঘটছে—তাঁর উদারতা ও উন্নত চরিত্র সত্ত্বেও জগতের অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াইতে জয়ী হতে পারছেন না। মানব-জীবনের যা কিছু আদর্শ যা কিছু মূল্যবান—সবই যেন নিয়তির ক্রুর চক্রে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায়—ধ্বংস হয়ে যায়। ইহাই ট্র্যাজেডির দ্রষ্টব্য। আবার অনেকে বলেন—যে সমস্ত দুঃখের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই নায়কের সাহস আর তার মধ্যে দীপ্যমান মঙ্গলের প্রকাশ। নায়কের মৃত্যু ঘটলেও তাঁর সেই চারিত্রিক এবং আদর্শগত গুণাবলি আমাদের মনে ও অনুভূতিতে বিরাজিত থেকে গৌরব-দান করে আমাদের। দুঃখের দহনেই নায়কের ভিতরের উজ্জ্বল মহান ভাবরাশিকে প্রকাশ করে। ট্র্যাজেডির অন্ধকারই মানুষের উন্নত গুণগুলিকে উজ্জ্বল করে ধরে।

ট্র্যাজেডিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে তিনটি ভাব পাই। প্রথম : নায়কের দুঃখ-ভোগ। দ্বিতীয় : নায়কের উচ্চ জীবন ও তাঁর হৃদয়ের উত্তাল ভাব ও আবেগরাশি ও গভীর অনুভূতি সকল তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যেন অমূল্য ও স্মরণীয় করে তোলে। এই প্রাণবান নায়কের জীবন আমাদের মুগ্ধ করে। তৃতীয় : নায়কের জীবনে নিয়তির নিঃশব্দ কুটিল পদচারণ যা দেখে আমরা হই যুগপৎ ভীত ও চমৎকৃত। এইরূপ এক অদৃশ্য ও অমোঘ শক্তির পরিচয়-লাভে আমাদের অন্তরে একটি অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার ঘটে। যেন কোনও নির্মম কঠিন দেবতার সম্মুখীন হয়েছি—তাঁর অপরিসীম শক্তি প্রাণে জাগায় ত্রাস-বিস্ময়ের মুগ্ধতা অথচ তাঁর দয়া-মায়া বা ন্যায় বিচারের পদ্ধতি আমাদের অজানা থাকায় সদা ভীত ত্রাসিত হয়ে থাকতে হয়।

গ্রীক নাটকে (এবং বাংলা যাত্রা এবং পালা-নাটকেও) নিয়তিদেবীর যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ঘটত—দর্শক-কুল উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে যেত। যে সমস্ত

নাটকে নিয়তির প্রকাশ্যে দর্শন ঘটেনা — সেখানেও তাঁর অবস্থিতি ও লীলার নিদর্শন পাওয়া যায় নাটকের ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে এবং নায়কের নির্ঘাত পতনে। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিতে এই নিয়তির স্থান খুব স্পষ্ট ছিল এবং অনেকের মতে ইহাই গ্রীক নাটকের উৎকর্ষের কারণ। নায়ক কোথাও একটু দোষত্রুটি ঘটিয়ে ফেলতেই নিয়তিদেবী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন শুরু করলেন। নায়কের সমস্ত গুণ, বিচার-বুদ্ধি এবং উচ্চ দেবোপম চরিত্র ব্যর্থ হয়ে যায় নিয়তির অমোঘ বিধানে। পরিশেষে নায়ক বিধ্বস্ত হয়ে হার মেনে মৃত্যু-বরণ করেন। নিয়তির সার্বভৌমিকতাই নাটকের সর্বজনীনতার কারণ হয় তখন। আধুনিক নাটকে নিয়তির তেমন স্থান নাই — সেখানে নায়ক-নায়িকার আদর্শ ও বিচার-বুদ্ধিই তাদের জীবনকে একটি পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই আধুনিক যুগে ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত।

পঞ্চম অধ্যায়

আর্টে বাস্তবিকতা

অনেক সময় সিনেমা বা নাটক দেখে আসার পর আমাদের মধ্যে ঐ সিনেমা বা নাটকে বাস্তবের সঙ্গে মিল আছে কি নেই এই প্রসঙ্গে নানা তর্ক ওঠে। একজন হয় তো বলেন ঐ সিনেমা বা নাটকের বিভিন্ন ঘটনায় বাস্তবের সঙ্গে অমিল থাকায় মনকে তেমনস্পর্শ করেনি। তখন আর একজন জবাব দেন ঐ সিনেমা বা নাটকেব বিভিন্ন ঘটনায় ঐ সময় স্থান-কাল-পাত্রে কিছুটা বাস্তবের অভাব ঘটে থাকলেও—ঐ সিনেমা বা নাটক চলাকালীন নজরে তেমন পড়েনি বলে অভিনয় উপভোগের ব্যাঘাত ঘটেনি। সুতরাং রসের দিক হতে কোনও ক্ষতি তো হয়ই নি এবং লাভই হয়েছে। যেমন—শেকস্‌পীয়েরর অমন সুন্দর নাটক 'ওথেলো'র মস্ত একটি ত্রুটি :—ইয়াগো বলছে সে ক্যাসীওর কাছে ওথেলোর রুমালখানি দেখেছে—আর ওথেলো সেই কথা বিশ্বাস করছে—যদিও সে একটু আগেই রুমালখানি ডেসডিমোনার কাছে দেখেছে। 'ওথেলো' নাটকের এই দোষটি যখন কোনও নাট্য-সমালোচক প্রথম উত্থাপন কবেন—তখন বহু রসিকজনই স্বীকার করেছিলেন যে তাঁরা অতটা নজর' করতে পারেননি এবং তাঁরা আরও বলেছিলেন যে বুদ্ধির অনুসন্ধিৎসা-দ্বারা কাব্য বা নাট্যশৈলীর বা রচনার যে সব দোষ আবিষ্কার করা যায়—তা' কিন্তু কাব্য বা নাট্যরসে নিমগ্ন তন্ময় পাঠকের বা দর্শকের বা শ্রোতার রসপিপাসু মন নজর করতে পারে না। সুতরাং রসোপলব্ধির দিক হতে তাঁদের কোনও অভাব বা হানি-বোধ হয় না। অতএব আর্টের দিক হতে এই খুঁত অতি তুচ্ছ।

কিন্তু এই সমস্যাটি এতো সহজেই সমাধান হবার নয়। কারণ যাঁদের চোখে এই খুঁত বা দোষ ধরা পড়ল—তাঁরা ঐ কাব্য বা নাট্য বা কাব্যনাট্যের

রসগ্রহণে বঞ্চিত হলেন। ফলে শিল্প বা আর্ট (Art) তাহলে ঐ সময় সকলকে তুষ্ট বা তৃপ্ত না করতে পেরে কিছুটা 'দোষী' থেকে গেল। যদি 'ওথেলো' পাঠকের শতকরা দশজন পাঠকও বলেন যে কবি ভুল করেছেন—তাহলে কবি-সমর্থকরা যতই বলুন যে 'ভাবরাজ্যে' এ ভুল ভুলই নয়'—যুক্তির খাতিরে ঐ সমর্থনটিও ভুল হয়ে দাঁড়ায় কারণ ঐ ত্রুটিটি না থাকলে তো 'ঐ নাটক-পাঠকের মনে কোনও খটকাই থাকত না। শেষ পর্যন্ত কোনও কাব্য বা নাটকের মূল্য বিচার করার একমাত্র কষ্টি পাথর হলো পাঠকের বা দর্শকের মন—যদিও এই মন স্থান-কাল-পাত্রের সহিত পরিবর্তনশীল। যদি শেকস্পীয়রের নাটক বা কাব্য দুহাজার বৎসর পরে কারুর ভালো না লাগে—তখনকার কলা-সমালোচকদের শত সমর্থনেও পাঠক-মনের মোড় ফিরবে না। কারণ, সমালোচনার জোরে নাট্য-রসকে তুলে ধরা যায় না বা নামিয়ে দেওয়া যায় না। যদি দু হাজার বৎসর পরে শেকস্পীয়রের নাটকের আবেদন দর্শকের মনকে স্পর্শ না করে তাহলে তো ঐ নাটক শুধু মনস্তত্ত্ববিদের ঐতিহাসিকের আর কলা-সমালোচকের গবেষণার বিষয় হয়ে যাবে।

অতএব নাটক বা কাব্য-পাঠকের অথবা দর্শকের অর্ধেক যদি 'আর্টে' বাস্তব-বোধের অভাব সম্বন্ধে নালিশ করেন আবার অর্ধেক পাঠক বা দর্শক তা' অস্বীকার করেন তাহলে সমস্যা দারুণই হয় বটে। কোন্ পক্ষের বক্তব্য সত্য? আর কে বা তার বিচার করবে? বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা? কিন্তু তাঁরাও তো এই সকল মত-পার্থক্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়তে পারেন? তাহলে কি শিল্পে বা আর্টএ (Art) সত্যাসত্য বোঝা যায় না? এই রাজ্যে কি তবে ঘোর অরাজকতা যার কাছে যা ভালো তাই তার কাছে সত্য?

আপাত দৃষ্টিতে কতকটা তাই বটে। তবে এই অরাজকতার মধ্যেও কিছু কিছু নিয়ম-কানুন দেখা যায়। ভাব-রাজ্য শুধুই খেয়াল-খেলা নয়—একটু তলিয়ে দেখলে সেখানেও একটি সঙ্গতির ধারা খুঁজে পাওয়া যায়।

উচ্চমানের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সম্পন্ন দুই বন্ধু। দুজনেই আর্টের সমান ভক্ত ও অনেক বিষয়েই দুজনে প্রায়ই একমত হয়ে যান। কিন্তু এক মধুর

সন্ধ্যায় দুই বন্ধু একসঙ্গে একটি সুন্দর নাটক দেখতে গেলেন। চরম অভিনয়ের মুহূর্তে একজন স্বগতোক্তি করে উঠলেন 'ছি-ছি! এ অসম্ভব—absurd—এ কখনো হতে পারে?…নাটকটাই মাটি!' অন্য বন্ধু তখন তন্ময় অভিনয়েতে—একটু বিরক্তি-জড়িত সুরে বাধা দিলেন 'কেন—অসম্ভব আবার কি? তুমি না বুঝেই দোষ ধরছ!' প্রথমজন এখানে সত্যই রসভঙ্গের কষ্ট পেলেন, কিন্তু অপর জন পেলেন না। তাহলে কি দ্বিতীয় জনের একাগ্রতা বা রসোপলব্ধি কম? কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল দুজনেই বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমকক্ষ এবং কাব্য বা নাট্যছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ছোট ছোট অসামঞ্জস্য দুজনেরই চোখে পড়ে। তবু নাটকের বেলাতেই ঘটল তাঁদেব মতদ্বৈধ। একজন বলছেন 'এ অসহ্য—দেখার মত নয়…।' অপরজন বিরক্তিতে বাধা দিয়ে তাঁকে জবাব দিচ্ছেন 'তুমিই বেরসিক—বোঝোনা…'।' এ দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি কে করবে?

নিষ্পত্তি করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। অনেক স্থলেই এ সব ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয় না। তবে বিষয়টি শান্ত মনে চিন্তা ও আলোচনা-দ্বারা খুঁটিয়ে দেখা উচিত যে দুজনের এই মতবিরোধের মধ্যে কোনও ঐক্য সূত্র খুজে পাওয়া যায় কি না—বা দুজনের এই মতদ্বৈধ কতোখানি এবং ঠিক কোথায় ও কি নিয়ে? অনেক সময় এই রকম আলোচনায় দেখা যায় যে আসলে বিরোধ কিছুই নেই শুধু বলবার ভঙ্গী নিয়ে ঝগড়া! আবার অনেক সময় কেঁচো খুড়তে সাপও বেরোয়!

এ ক্ষেত্রেও সাপই বেরুবে! দেখা যাবে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ এই আমাদের 'বন্ধুদ্বয়' তাঁদের নানা বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের আসল পার্থক্য একেবারে মূলে এবং উভয়ের সেই ব্যবধান সুগভীর। আর এই পার্থক্য কি আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও ঘরে-বাইরে নিয়তই উপলব্ধি করে বলে উঠি না 'ওকে চিনতে পারিনি…!'

শিশুর কাছে সবই সত্য মনে হয়। প্রকৃতি দেবী তাঁর যা কিছু আয়োজন তার সমুখে এনে ধরেন সে সবটুকুকেই নির্বিচারে সত্য বলে গ্রহণ করে। তার, কাছে চাঁদ, তারা আকাশ, হাওয়া, মেঘ-গাছপালা, ফুল ও

পাখী সবই এবই রকম জীবন্ত। তার জগতে কোথাও অসামঞ্জস্য নেই, 'সব ঠিক আছে' এমন ভাব। তেমনই স্বপ্নেও আমরা কোনও কিছু বেখাপ্পা দেখিনা—অদ্ভুত সব স্থান-কাল পাত্র মোটেই অবিশ্বাস করি না। স্বপ্নে ও শৈশবে আমরা যা দেখি বা শুনি নির্বিচারে মনেতে গ্রহণ করি। এই 'গ্রহণ' করাকে 'স্বতঃবুদ্ধি' দ্বারা 'বোধ' করা বলা যেতে পারে। শৈশবোত্তীর্ণ অবস্থায় বা জাগ্রত অবস্থায় সাধারণতঃ আমরা যা দেখি বা শুনি বিচার-বুদ্ধি দ্বারাই যাচাই করে নিই। প্রকৃতি-চরাচর দেখে শুনে আমরা কতকগুলি 'ধারার সন্ধান পাই এবং যাকিছু এই ধারা এড়িয়ে যায়—তাই আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য, আকস্মিক বা অত্যাশ্চর্য মনে হয়। তাই আমরা বাড়ীতে ধুপ্‌ধাপ শব্দ শুনতে পেলে ছুটে যাই চারদিক অনুসন্ধান করতে আর যদি কোনও কারণ খুঁজে না পাই—ভুতের ভয়ে আঁৎকে উঠি।

সুতরাং নাটক দেখতে বসে আমরা প্রথমে সরল বিশ্বাস নিয়েই শুরু করি—যা পাই—তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করি ঃ এক রাজা, তাঁর দুই রানী, চার ছেলে।···এ ভালো, ও মন্দ। রানীদের মধ্যে হিংসা—ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সময় আমরা ভাববৈচিত্র্যই লক্ষ্য করি—আমাদের মন তাতেই ডুবে থাকে। বিচার বুদ্ধি অকেজো হয়ে একপাশে পড়ে থাকে। শুধু 'স্বতঃ-বুদ্ধি'র সাহায্যেই আমরা বেশ আনন্দ পাই। সাধারণতঃ আমাদের মনে অভিযোগ জাগে না—নাটকাভিনয়ের স্থান-কাল-পাত্রের খুঁটিনাটি বা ত্রুটি নিয়ে বরং অভিনয়ের রসটুকু বা ভাবটুকুই গ্রহণ করতে চাই অম্লান চিত্তে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাস্য কৌতুক

হাস্যকৌতুকেও সৌন্দর্য পাওয়া যায় এবং ইহাকে কলার মধ্যে একটা ধরা যাইতে পারে। হাস্য-রসটি যে পরিমাণে বিশুদ্ধ আনন্দ দান করে অর্থাৎ যে পরিমাণে উহা বাস্তব জীবনের স্পর্শ হইতে মুক্ত অনাসক্ত এবং কবিতার মত সর্বসাধারণের রুচিকর সেই পরিমাণে ইহা ললিতকলার অন্তর্গত। হাস্যরসের কবিতা বা গল্প উপন্যাস যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে পারে তা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি। কিন্তু যেখানে কাহাকেও আঘাত দিবার জন্য এবং নিজেকে বড় প্রমাণ করিবার জন্য রসিকতার প্রয়োজন হয় তখন তাহাতে হাস্য আসিলেও তাহা বিশুদ্ধ কাব্যরসের পর্যায়ে পড়ে না। তখন তাহার উপকারিতা থাকিতে পারে কিন্তু সেই প্রকার উপকারিতা ললিতকলার থাকে না।

এখন দেখা যাক হাস্যরসের উৎপত্তি কোথায়। মেরিডিথ ও শোপেনহাওয়ারের মতে হাস্যরসের উদ্রেক তখনই হয় যখন আমরা দুইটি ধারণার মধ্যে বিরোধ বা বৈপরীত্য দেখিতে পাই। একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। একজন গাঁজাখোর বলিল—'কাল রাতে নদীতে আগুন লেগে যায়, সব মাছ গাছের ডগায় উঠে থর থর করে কাঁপতে থাকে।' তা শুনে বন্ধু হেসে উঠল, 'দূর বোকা। মাছ কি গরু যে গাছে উঠবে?' দার্শনিক কান্ট বলেন যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় যখন আমাদের কোন উচ্চাশা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে, যেমন ফাটা ফানুষ। একজন যোদ্ধা বিদেশের রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল 'কি দেখলে ভাই বলতে হবে'। যোদ্ধা খুব উৎসাহের সহিত বলিল, 'দেখলাম মদ সেখানে ভীষণ সস্তা কিন্তু নদীতে মাছ ধরে সুখ নাই, সব ছোট ছোট, তাও বিস্বাদ।'

যোদ্ধার কাছ হইতে যুদ্ধের অনেক বীরত্বপূর্ণ লোমহর্ষক গল্প শুনিবে সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল সে কেবল মদ গিলিয়াছে আর মাছ ধরিয়াছে, যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খবরই সে দিতে পারে না। সুতরাং তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিবে।

আবার অনেকে বলেন, হাস্যরস নিছক আনন্দকর ও সরল নয়। ইহাতে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। আমরা যখন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া হাসি তখন মনে মনে এই বোধ হয় আমরা ইহার ওপরে, আমাদের দ্বারা এরকম ভুল হইতে পারে না এবং একপ্রকারে হাস্যস্পদ ব্যাপারটির জন্য যে দায়ী তাহাকে আমরা ছোট বলিয়া নিজে বড় হইয়া যাই অর্থাৎ অপরের মাথা ভাঙিয়া নিজে বেশ একটু আত্মগরিমা অনুভব করি।

হাস্যরস সম্বন্ধে বার্গসাঁর মতবাদটি অনেকেরই জানা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, মানুষ জড়বস্তু নয়, সে চৈতন্যপ্রধান, সুতরাং সে বহির্জগতের সহিত সমানে সমানে পা ফেলিয়া সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবে ইহাই আমরা আশা করি। এখন যদি আমরা দেখি যে, সে উহা পারিয়া উঠিতেছে না, সে জড় পিণ্ডের মত জবুথবু, উঠিতে বসিতে চলিতে একটা না একটা বিপাকে পড়িতেছে, বিভ্রাট বাধাইতেছে, অর্থাৎ যদি দেখি যে তাহার মধ্যে নমনীয়তার অভাব ঘটিয়াছে—তাহা হইলে আমাদের হাসি পায়। একজন পথ চলিতে হঠাৎ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে এই জন্যই আমাদের হাসি পায় এবং আমরা হাসি চাপিয়াই কোন মতে তাহাকে উঠিবার জন্য সাহায্য করি। আমরা ভুলোমনওয়ালাদেরও দেখিয়া হাসি, কারণ তাঁরাও কোন একটি কথা লইয়া ভুলে থাকেন, দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন না—ইহাই জড়ত্ব বা যান্ত্রিকতা।

আমরা চাই মানুষের চৈতন্য জাগ্রত থাকুক এবং তাহার স্বচ্ছন্দ কাজ চলিতে থাকুক। ডন কুইকজোটের কথা ভাবিয়া আমরা হাসি, কারণ একটি ধারণাই তাঁহাকে চালাইতেছে, তার চৈতন্যের মুক্ত গতি আর নাই। কেহ পরভূষা পরিলে আমাদের হাসি পায় কারণ সেই ভূষণ তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। তেমনি কেহ যদি মুখব্যঙ্গ করে তাহা

হইলেও হাসি পায়।

অনেক কর্মচারী বহুদিন একই কাজ করিয়া স্বাধীন সহজ বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন এবং যান্ত্রিক হইয়া যান। তাঁহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহার হাস্যোদ্দীপক হয়। কাঠের পুতুলের মত তাঁহারা নিয়মে চলেন। একটি লোক গাড়ীতে খুন করে—স্টেশনমাস্টার তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে সে গাড়ীর উল্টা দিক হইতে নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং রেলকোম্পানীর অমুক নম্বর আইন অমান্য করিয়াছে এবং তাহার জরিমানা এত টাকা হইবে। আর একটি গল্প আছে। কোন যাত্রীবাহী জাহাজ কোন একটি বন্দরের কাছে আসিয়া হঠাৎ ঝড়ে ডুবিয়া যায়। যাত্রীরা কোনক্রমে সাঁতরাইয়া অর্ধমৃত অবস্থায় যখন বন্দরে আসিয়া ওঠে, তখন একজন কর্মচারী তাঁহার কর্তব্যকর্ম সারিয়া ফেলিতে গেলেনে এবং সকলের নিকট হইতে ছাড়পত্র চাহিতে লাগিলেন।

মানুষ যখন জড়পিন্ডের মত হইয়া যায় তখন যে তাহা দেখিয়া হাসি পায় তাহার অতি সহজ উদাহরণ পাই 'ডন কুইকজোট' গল্পে। সেখানে সাঙ্কো পাঞ্জাকে কম্বলের উপর ফেলিয়া সকলে কম্বলটিকে চারিদিক হইতে টানিয়া ধরিয়া পাঞ্জাকে একবার শূন্যে ছুড়িয়া ফেলিতেছে আবার কম্বলে পড়িয়া গেলে ফের ছুড়িয়া দিতেছে। এই দৃশ্যটি কল্পনায় দেখিলে মনে হয় সাঙ্কো পাঞ্জা আর জীবন্ত মানুষ নয়, কোন কাঠের পুতুল এবং তখনই হাসি আসে। কোন ভদ্রলোক স্টেশনের মালপত্র গুণিতে গুণিতে তাঁহার স্ত্রীকে ও পুত্রগুলিকেও গুণিয়া ফেলিলেন, আমরা হাসিয়া উঠি, কারণ ঐ স্ত্রী পুত্রগুলিও ঐ জড় পদার্থের দলে পড়িয়া গেল।

কথাবার্তায় কোন কোন শব্দ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি হাস্যোদ্দীপক কারণ তাহা হইতে বক্তার যান্ত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতুকপ্রধান নাটকের পাত্র-পাত্রীদের প্রায়ই কোন না কোন বিশেষ প্রিয় শব্দ থাকে যা তাঁরা বার বার ব্যবহার করিয়া দর্শকদের হাসান। যেমন কেহ কেহ বলেন, 'মানে কিনা' কেহ বলেন, 'আমি বলছিলাম কি' ইত্যাদি।

বার্গসাঁর মতে কিন্তু হাস্যকৌতুক বিশুদ্ধ আর্ট নয়। ইহার আনন্দে

একটু তিক্তরস আসে। একেবারে কাব্যরসের মত স্বচ্ছ নয়। আমরা হাসি দিয়া অপরের স্বকীয়তা ও স্বচ্ছন্দ গতির অভাবকে তাহার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেই। হাসি একটি সামাজিক কর্তব্য করে। অপরের সামাজিকতা বোধকে জাগ্রত করিয়া ও তাহার জড়ত্ব দোষকে শোধরাইতে সাহায্য করে। সতরাং ইহা বাস্তবজীবন ও ললিতকলার মাঝামাঝি একটি বস্তু—বিশুদ্ধ কলা নয় এবং সেই জন্য বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অনুভূতিও ইহার দ্বারা হয় না।

সংযোজন :

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় সৌন্দর্য-দর্শন

ভারতীয় সৌন্দর্য-দর্শনের কয়েকটি মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় এবং এই বিবরণের আলোচনা হতেই সম্যক উপলব্ধি করা যাবে যে ভারতে সৌন্দর্য সম্বন্ধে সুপ্রচুর চর্চা ও বিশদ আলোচনা ঘটেছে। যে সমস্যাগুলি নিয়ে ভারতীয় সৌন্দর্য-দার্শনিকেরা চিন্তা করেছিলেন সেগুলি পাশ্চাত্য দেশের সমস্যাগুলি হতে কিছুটা ভিন্ন প্রকারের। 'সৌন্দর্য' ও 'ললিত-কলা' বলতে পাশ্চাত্য সৌন্দর্য-দার্শনিকেরা প্রথমেই ইন্দ্রিয়জ সুখ, বহির্বস্তু ও ভাবাবেগের অনুকরণ, ভাবের প্রকাশ এবং ভাবের বিষয়-বস্তু ও আধার—এই সব কথাই বিশেষ করে চিন্তা করেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকেরা অন্য কয়েকটি ধারণা দিয়া 'সৌন্দর্য'কে বুঝতে চেয়েছেন—যেমন: 'রস', 'অলঙ্কার', 'রীতি', 'ধ্বনি', 'ঔচিত্য' ইত্যাদি। তাই এই আলোচনায় ঐ কয়েকটি ধারণাকেই কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করে ধরার চেষ্টা করব—কেননা ঐ ধারণাগুলিকে অবলম্বন করেই ভারতীয় সৌন্দর্য-দর্শনের এক একটি মতবাদের সূত্রপাত ঘটেছে।

॥ রস ॥

অনেকে 'রস'কে কাব্যের আত্মাস্বরূপ মনে করেছেন—যেমন অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ এবং কেশবমিশ্র। তাঁরা কাব্যের অন্যান্য গুণগুলিকে যেমন ধ্বনি, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতিকে কাব্যের অঙ্গ হিসাবেই দেখেছেন, অর্থাৎ রস প্রকাশের উপায় হিসাবেই মূল্য দিয়েছেন। এই সময়ে প্রশ্ন হতে পারে 'রস' বলতে আমরা কি বুঝব? ইহা সাধারণ ইন্দ্রিয়জ সুখ বোধ বা মানসিক ভাবাবেগও নয়—ইহাকে অলৌকিক এবং 'পরব্রহ্মাস্বা

সচিব:' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইহা সাধারণ চিত্ত-বৃত্তির উর্দ্ধে এক স্বতন্ত্র বৃত্তি—যাকে 'সৌন্দর্য-বোধ' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সাধারণ চিত্তবৃত্তি ব্যক্তিগত আর রস নৈর্ব্যক্তিক। কোনও বিশেষ ভয় উৎপন্ন হলে আমাদের দুঃখ বা উদ্বেগ হয়। কিন্তু কাব্যে যখন ভয়ের কথা পাঠ করি বা শ্রবণ করি বা নাটকে দর্শন করি—তখন 'ভয়-ভাব'টি সাধারণ ও নির্মল একটি ভাব হিসাবেই উপভোগ করি এবং তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনও লৌকিক সম্বন্ধে জড়িত হইনা। এজন্য যে রসটির প্রতীতি জন্মে তাহা ভয় হতে উৎপন্ন হলেও আনন্দদায়ক হয়। কাব্যে লৌকিক ভাবগুলিকে সাধারণীকরণ করা হয়—অর্থাৎ ভাবগুলিকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুভব-সম্পর্কহীন করে দেওয়া হয় এবং তখন তারা সাধারণ ভাবে (অর্থাৎ সবিশেষ ভাবে) চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এই প্রকরণেই রসের সৃষ্টি হয়—তখন এই ভাবটি কাব্যে বর্ণিত নায়কেরও নয় আবার পাঠক, দর্শক বা শ্রোতারও নয়। স্বগতত্ব অথবা পরগতত্ব কোনও বন্ধনই তার থাকে না। এই মুক্ত ভাবটি তাই আমাদের লৌকিকভাবে উত্তেজিত করতে পারে না—এবং সেইজন্য যে কোনও ভাবই হোক না কেন তার দ্বারা যে রসের অনুভূতির উন্মেষ হয়—তাহা বিশুদ্ধ আনন্দময়। এই কারণেই আমরা নাটকে ভয় বা শোকের দৃশ্য দেখে আনন্দই পাই। রসকে আনন্দময় বলা হয় এবং 'রস' আন্তর-বস্তু কোনও বহির্বস্তুর উপর নির্ভর করে না বা কোনও সুদৃঢ় কার্য-কারণ-সূত্রেরও ইহা বশবর্তী নয়। সামান্য ঘাস-ফুল বা দুটি মধুর কথা আমাদের চিত্তে গভীর রসের অনুভূতির জাগরণ ঘটাতে পারে আবার কোনও মহাকাব্য পড়ে বিরক্ত হতে পারি।

রস-সম্ভোগকে অনন্যপরতন্ত্র বলা হয়। কাব্য-কলাকেও এই আখ্যা দিতে হয় কারণ রসই তার আত্মা। যেহেতু রসানুভূতির সঙ্গে তার উপাদানগুলির কোনও কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাই—অর্থাৎ রস-বস্তু অলৌকিক এবং লোকোত্তর, সেইজন্য যে কোন ভাব হতেই রস উন্মেষিত হলে তাহা আনন্দদায়কই হয়—সেই ভাবটি দুঃখ, শোক বা ভয় যাই হউক না কেন।

এই ভাবগুলিকে তাই উপাদান—কারণ না বলে রস-সঞ্চারের সহায় বললেই যথেষ্ট হয়।

এই রস কয়েকটি বস্তুকে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয় এবং ঐ বস্তুগুলি 'অবলম্বন-বিভাব' নামে অভিহিত। যথা—নাটকের পাত্র পাত্রী। উপরন্তু রসকে উদ্দীপিত করতে কয়েকটি পারিপার্শ্বিক অবস্থারও প্রয়োজন হয়। যেমন—শৃঙ্গার-রসের ক্ষেত্রে চাঁদ, দক্ষিণ সমীর, কুহুতান ইত্যাদি। ইহাদের 'উদ্দীপন-বিভাব' বলে। বিভাব ছাড়াও রসোদ্গারের জন্য আরও কয়েকটি বস্তুর প্রয়োজন হয়, যথা—নায়িকার তির্যক দৃষ্টি, সলজ্জ হাসি ইত্যাদি। ইহাদের 'অনুভাব' বলা হয়। কোনও একটি প্রধান ভাবকে স্থায়ী ভাব বলা হয় যেমন শৃঙ্গার-রসে রতি-ভাবটি স্থায়ী ভাব। কিন্তু এই স্থায়ী ভাবটির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক ভাবাবেগ চিত্তকে চঞ্চল করে স্থায়ী ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলে। উদাহরণতঃ—শৃঙ্গার-রসের ক্ষেত্রে স্থায়ী ভাব 'প্রেম' (রতি)—কিন্তু অস্থায়ী আনুষঙ্গিক ভাব হল 'লজ্জা' 'ভয়' ও 'আনন্দ'। ইহারা 'ব্যভিচারী ভাব' নামে অভিহিত।

এখন কোনও লৌকিক কারণে যদি আমরা ভীত, ক্রুদ্ধ বা প্রেম-বিগলিত হই—তখন সেই ভয়, ক্রোধ ও প্রেম সাধারণ লৌকিক চিত্ত-বৃত্তি হিসাবেই আমাদের চঞ্চল করে কিন্তু তাতে রস উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কাব্যে বা নাটকে যখন এই সকল ভাবের অভিব্যক্তি দেখি তখন রস-প্রতীতি জন্মে। তখন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী-ভাবগুলি পরস্পরকে পোষণ করে এবং সকলে সম্মিলিতভাবে রসের সৃষ্টি করে।

রস কয়টি বা অনুভাব-বিভাব কতগুলি এ প্রশ্নের মীমাংসাও ভারতীয় সৌন্দর্য-দার্শনিকেরা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কোনও বাঁধাধরা নিয়মাবলী অথবা তালিকা তৈয়ারী করা সম্ভবপর নয়। কারণ মানুষের ভাবগুলির সঠিক বর্ণনা এবং পরিগণনা দুষ্কর। যেমন রঙ বলতে কেবল সাতটি রঙই বোঝায় না, বরং এই সাতটির মাঝে যে অসংখ্য রঙ আছে এবং প্রত্যেকটি আর একটির সঙ্গে সংযুক্ত—যার একটি হতে তার পরেরটির মধ্যেও কোন দৃঢ় রেখা টানা যায় না এবং সেই সংবন্ধ সমষ্টিগত

রঙের জগৎকে মনে পড়ে যায়। আমাদের ভাবগুলিও তেমন। একটি হতে একটিতে অতি সহজেই যাওয়া-আসা করা যায়। অমোদের ভাবজগৎ ঐরূপ সংবন্ধ হয়ে বিরাজ করে নানা বৈচিত্র্যে—তাদের একেবারে পৃথক ভাবে দেখা যায় না।

তবুও সাধারণভাবে আমরা দেখি যে আমাদের কয়েকটি স্থায়ী ভাব আছে যেগুলির প্রকাশে যে রসপ্রীতি জন্মে—তাহা মূলতঃ আনন্দময় হলেও এই ভাবগুলির গুণ কিছু কিছু পায়। এই স্থাযী ভাবগুলি নয়টি বলে মনে করা হয়েছে—যেমন, 'রতি', 'হাস্য', 'করুণ', 'বীর', 'উৎসাহ'. ক্রোধ', 'ভয়', 'বীভৎস' ও 'অদ্ভুত''। প্রত্যেকটির প্রকাশে এক একটি রসের প্রতীতি হয়। যেমন রতি হতে শৃঙ্গার-রস ও বীরভাব হতে বীররস ইত্যাদি। এই স্থায়ী ভাবের তালিকাটি বাড়িয়ে নেওয়া যায় এবং তার সঙ্গে রসের সংখ্যাও বেড়ে যাবে। যেমন 'বাৎসল্য' ও 'ভক্তি-রস' যোগ করা যায়। ভক্তি-রস বলতে সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তি বোঝায়। কিন্তু কেন্দ্রীভূত অর্থে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, স্বামীভক্তি প্রভৃতি এবং ব্যাপক অর্থে স্বদেশভক্তি বা মানব-প্রেমও বুঝাইতে পারি। বীররস বলতেও আজকাল আর যুদ্ধ-বীরের কথাই মনে হয় না -ধর্মবীর বা অহিংস বীরের কথাও ভাবি। নেতাজী সুভাষের জীবন তো অবিসংবাদিত বীরগাথা। মহাত্মা গান্ধীর জীবনও অনেক স্থলেই বীরগাথার মতই শোনায়। স্থায়ী ভাবের পরিগণনা ছাড়া বিভাব-অনুভাব ব্যভিচারী ভাবগুলিরও পরিগণনা ভারতীয় কাব্য-দর্শনে পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখতে পাই রস-দ্বারা সৌন্দর্যকে বুঝতে চেষ্ট করা হয়েছে। সৌন্দর্যানুভূতিকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার বলেই রস-বাদীরা তুলে ধরেছেন। কাব্যে এক একটি স্থায়ী ভাবের প্রকাশ হয় নানা বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী-ভাব দ্বারা এবং এগুলি উপভোগ করা হয় 'অলৌকিক ভাবে'—ব্যবহারিক ভাবে নয়। এইগুলির দ্বারা আমরা তেমন ভাবে প্রভাবান্বিত হইনা—যেমনটি বাস্তব-জীবনে হই। বরং এই সব ভাবগুলি মিলে আমাদের প্রাণে একটি বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং তাকেই 'রস' নামে

অভিহিত করা হয়। যদিও ঐ ভাবগুলির অনুরঞ্জন রসে কিছুটা থেকেও যায়, তথাপি ঐ ভাবগুলি হতে 'রস' একটি স্বতন্ত্র' ও লোকোত্তর বোধ—যাতে আনন্দই আছে বিক্ষোভ নাই।

॥ **অলঙ্কার** ॥

ভারতীয় সৌন্দর্য-দার্শনিকদের সাধারণতঃ 'আলঙ্কারিক' বলা হয়—কারণ, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অলঙ্কারকে কাব্যের প্রাণ বলে মনে করতেন। এঁদের মধ্যে নন্দন-দার্শনিক ভামহের নাম বিশিষ্ট। তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভামহের মতে কাব্যের প্রধান লক্ষণ অলঙ্কার এবং অলঙ্কারের মূলে 'বক্রোক্তি'। তিনি স্বভাবোক্তিকে কোনও অলঙ্কার বলে মনে করেন না এবং স্বাভাবিকভাবে কোনও কিছুর বর্ণনাকে তিনি 'কাব্য' আখ্যা দেন না। ভামহ রসকে কাব্যের আত্মা বলে মানেন না—বরং 'রসবৎ' বলে একটি অলঙ্কারের বর্ণনা দিয়াছেন। অর্থাৎ রস বক্রোক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। রসবাদীরা অলঙ্কারকে কাব্যের বহিরাবরণ বলেন। কিন্তু সৌন্দর্য-দার্শনিক ভামহ, উদ্ভট রুদ্রট, এবং কুন্তক একথা স্বীকার করেন না, তাঁরা ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধনের মতবাদকেও মানেন না। তাঁরা 'ধ্বনি'কে কাব্যের আত্মা বলে মনে করেন না—বরং বলেন যে ধ্বনি দ্বারা যে সৌন্দর্য প্রকাশ ঘটে থাকে—তাহা কয়েকটি অলঙ্কার-দ্বারাই হয়। যেমন—'ব্যাজ স্তুতি', 'অপ্রস্তুত প্রশংসা', 'পর্যায়োক্ত' এবং 'সমাসোক্তি'। সৌন্দর্য-দার্শনিক বামন ও দন্ডী 'রীতি'কে কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ বলে মনে করেন। কিন্তু আলঙ্কারিকগণ সে মতবাদকেও প্রাধান্য দেন না—কারণ, রীতি অর্থে শব্দ-যোজনা ও বাক্য-সংগঠনই বোঝায়। কিন্তু আলঙ্কারিকগণ শব্দ এবং তার অর্থের সাহিত্য নিয়েই বেশী ভাবেন। তাঁরা অনেকগুলি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের উল্লেখ করে তাদের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এই অলঙ্কার ব্যতীত কাব্য হয় না—ইহাই তাঁদের মত। শব্দালংকার কয়েকটি—যেমন 'বক্রোক্তি', 'শ্লেষ', 'চিত্র', অনুপ্রাস' ও 'যমক'। অর্থালঙ্কার অনেকগুলি—যেমন, 'উপমা', 'রূপক' 'দীপক',

'আক্ষেপ', 'ব্যতিরেক' ইত্যাদির সঙ্গে সাধারণতঃ আমাদের পরিচয় ঘটে থাকে।

॥ রীতি ॥

দার্শনিক দণ্ডী ও বামন 'রীতি' কেই কাব্যের আত্মা বলে মনে করেন। কাব্যের অনেকগুলি গুণের কথা তাঁরা বলেছেন এবং আরও বলেন—উত্তম রীতি তাকেই বলা হয়—যাহাতে সবগুলি গুণই বিদ্যমান অথচ কোনও দোষ নাই। অলঙ্কারকে এখানে একটি অন্যতম গুণ বলেই ধরা হয়েছে। গুণযুক্ত এবং দোষহীন শব্দার্থ যদিও অলঙ্কার বিহীন হয় তবুও কাব্য বলে বিবেচিত হবে। এই গুণগুলির পরিগণনা নানা প্রকারে হয়। 'গুণ' অর্থে তাহাই যাহা 'বাক্য-শোভা' উৎপন্ন করে এবং অলঙ্কার সেইজন্যই একটি গুণ। দণ্ডী দশটি গুণের কথা বলেন—যেমন, 'শ্লেষ', 'প্রসাদ', 'সমতা', 'মাধুর্য', 'সৌকুমার্য', 'অর্থব্যক্তি', 'উদারতা', 'ওজঃ', 'কান্তি' ও 'সমাধি'। সৌন্দর্য-দার্শনিক দণ্ডী অলঙ্কারকে বিশেষ মূল্য দেন না। তাঁর মতে সব অলঙ্কারের মূলে অতিশয়োক্তি আছে। তিনি বক্রোক্তিকে তেমন মর্যদা দেননি আলঙ্কারিকদের মতো। বরং স্বাভাবোক্তি-কেই একটি প্রধান অলঙ্কার বলে স্বীকার করেন।

নন্দন-দার্শনিক বামনের মতে গুণগুলিকে আশ্রয় করেই রীতি বিদ্য-মান হয় এবং রীতিই কাব্যের আত্মা। 'বৈদর্ভ-রীতি' উত্তম—কারণ ইহাতে দশটি গুণই আছে। 'গৌড়ীয়-রীতিতে ওজঃ এবং কান্তি-গুণই প্রধান। 'পাঞ্চালী-রীতি' তে সৌকুমার্য ও মাধুর্য-গুণের প্রাধান্য আছে। তবে বামন অলঙ্কারগুলির মূল্য দণ্ডীর চেয়ে কিন্তু অধিক দিয়েছেন। তাঁর মতে গুণগুলির দ্বারা কাব্যের শোভা উৎপন্ন হয় এবং অলঙ্কার দ্বারা এই শোভার বৃদ্ধি ঘটে।

'গুণগুলি ছাড়া রীতি-বাদীরা অনেক গুলি দোষের বিবরণও দিয়েছেন যাহা হতে কাব্যের মুক্ত থাকা উচিত।

॥ ঔচিত্য ॥

সৌন্দর্য-দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র 'ঔচিত্য'-কেই কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ বলেন। ভামহ, দণ্ডী ও বামন প্রভৃতি অনেকেই কিন্তু এই ঔচিত্যকে কাব্যের একটি প্রধান গুণ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। গ্রীক সৌন্দর্য-দর্শনে 'সামঞ্জস্য' কে (Measure, Proportion, Appropriateness) সৌন্দর্যের মূল বলা হত। ঔচিত্য-অর্থে এই সামঞ্জস্য। 'উচিত'-স্থানে 'উচিত'-শব্দের প্রয়োগেই কাব্য-রস জন্মে—দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্রর এই অভিমত। ক্ষেমেন্দ্র কোন গুণের সহিত কোন গুণ মানায় এবং কোন রসের সহিত কোন রস একাত্ম ইত্যাদি অনেক প্রকার ঔচিত্যের বিবরণ দিয়েছেন। যেমন, 'বচনৌচিত্য', 'বিশেষনৌচিত্য', 'কালৌচিত্য', 'দেশৌচিত্য', 'অলঙ্কারৌচিত্য' 'রসৌচিত্য' ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যায় ঔচিত্য-বাদ সৌন্দর্যের শুধু একটি দিকই বিশদ রূপে তুলে ধরে এবং সৌন্দর্যের বিষয়-বস্তুকে সেরূপ মূল্য দেয় না। বাস্তবিক, শুধু সামঞ্জস্য হলেই সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয় না। কোনও মানবীয় ভাবের সকল প্রকাশ ঘটাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সামঞ্জস্য শুধু প্রকাশের আধার বা রূপ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। প্রকাশের বিষয়-বস্তুকে ভুললে চলবে না এবং এই বিষয়-বস্তু ও আধার বা ভাব আর তার রূপ এই উভয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্মিলনেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি। ঔচিত্য-বাদ ও রীতি-বাদ সৌন্দর্যের বহির্ভাগের উপরেই বেশী জোর দেন। অন্য ভাষায় বলতে গেলে তাঁরা ভাব-বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে তার প্রকাশের প্রণালীটি নিয়েই গবেষণা বেশী করেন।

॥ ধ্বনি ॥

সৌন্দর্য-দার্শনিক ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধনের মতে কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি'। তাঁরা বলেন যে আলঙ্কারিকেরা শুধুমাত্র কাব্যের বহিরঙ্গ নিয়েই বিচার করেন। কিন্তু কাব্যের প্রাণ উহাতে নাই। কাব্যের দুইটি অর্থ আছে—বাচ্য ও প্রতীয়মান। বাচ্যার্থকে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার নানা

ভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রতীয়মান অর্থটি তাহা হতে স্বতন্ত্র এবং ইহা মানব শরীরের লাবণ্যের মতো কাব্য-শরীরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েও সেই শরীরের (অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও অলঙ্কারের) দ্বারা বোঝা যায় না। ধ্বনিই রসকে প্রকাশ করে। 'রস-বস্তু' কোনও শব্দের অর্থ হতে পারে না —তাহা ধ্বনিত হয়ে থাকে। যে-কাব্যে ব্যঙ্গার্থ তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায় সেই কাব্যই উত্তম। যে কাব্যে মূল অর্থটি বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ গৌণ স্থান অধিকার করে সে কাব্য মধ্যম শ্রেণীর। আর যে কাব্যে শুধু বাচ্যার্থই আছে—ধ্বনি দ্বারা কোনও ব্যঙ্গার্থ চিত্তে দ্যোতনা জাগায় না, সে কাব্য নিম্ন শ্রেণীর। পাশ্চাত্য কাব্য-দর্শনেও এই ব্যঙ্গার্থের মাহাত্ম্য অনেকেই স্বীকার করেন ও বলেন শব্দের বাচ্যার্থের চেয়ে তার Suggestion বা Creating power কে বড় বলেন।

অষ্টম অধ্যায় ঃ

সৌন্দর্য-দর্শন প্রসঙ্গে কয়েকটি আধুনিক মতবাদ

এই প্রবন্ধে সৌন্দর্য-দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে কয়েকটি আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধেও কিঞ্চিত বর্ণনা করা গেল।

॥ আরোপ-বাদ ॥

কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ বলেন যে আমাদের সৌন্দর্যানুভূতির মূলে আছে আমাদের অন্তরের কোনও ভাবকে বাহিরের কোনও বস্তুর উপর 'আরোপ' করান। সেই বহির্বস্তুটি আসলে সুন্দর অসুন্দর কিছুই নয়। আমরাই আমাদের ভাবের রঙে তাদের রাঙিয়ে নিই এবং মনে করি তারাই ঐ ভাব প্রকাশ করে। যেমন সুমহান কোনও মন্দিরের উচ চূড়া দেখে মনে করি ঐ চূড়া কি মহিমায় আকাশ ছুঁতে চলেছে। আসলে আমরাই তাই চাই এবং সেই ভাবটি চূড়ার উপর আরোপ করি মাত্র। এই আরোপ-কার্য একেবারে সজ্ঞানে হয় না অথচ ইহা যে একেবারে অনিচ্ছাকৃত তাও বলা যায় না। আমরা আমাদের অনেক শারীরিক ও মানসিক ভাবকে বাহিরে রূপ-গ্রহণ করাতে চাই এবং কোনও আকার, রঙ বা শব্দের মধ্যে তার কিছু সাদৃশ্য বা মিল দেখলেই সেই আকার, শব্দ বা রঙের উপর আমাদের ভাবগুলিকে মেলে ধরি এবং তাদের 'বিষয়-রূপে' দেখি। এইরূপ দেখাতে সৌন্দর্য-বোধ জন্মে। তাই আমরা মনে করি 'আহা! আকাশের কি মুক্ত হাসি!' 'মাঠগুলি কি উদার বিস্তীর্ণ!' 'দেবতার পূজা-মন্দির কি পবিত্র—কি গভীর শান্তিতে ভরা…!'

আবার অন্য কয়েকজন বলেন যে আমরা আমাদের কোনও ভাবকে বহির্বস্তুর উপর আরোপ করি না—বরং বহির্বস্তুর ভাবটিকে অন্তরে

আরোপিত করি। যখন আমরা মন্দিরের মহিমান্বিত সুউচ্চ চক্র বা ত্রিশূল-শোভিত চূড়াটি দেখি—তখন আমাদের শরীরে মাংস-পেশীগুলি এমন অবস্থা ধারণ করিতে উদ্যত হয়—যাহা আমরা খুব মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে ঘটে। অথচ আমাদের শরীরের মাংসপেশীগুলি যেমন ছিল তেমনই থাকে—কারণ, আমরা হয়তো মন্দির-সোপানে বসেই মহাচক্র-শোভিত মন্দিরের চূড়াটি দেখছি। কিন্তু তবু আমাদের শরীরের মাংস-পেশীগুলির মধ্যে মৃদু সাড়া পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেও এক আনন্দময় উদ্দীপনার জাগরণ ঘটে। তখন আমরা দেব-মন্দিরের অঙ্গন-তলে বসেও পরম গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভাবটিতে অনুপ্রাণিত হই এবং অনুভবে ঐ মন্দির চূড়াকেই ঐ ভাবটিকে রূপ দিতে দেখি আর তাই ঐ মন্দির-চূড়াকে এত সুন্দর মনে হয়।

আবার অনেকের মতে উচ্চ মন্দির-চূড়াটি দেখে আমাদের আগে-দেখা কোনও সুউচ্চ নয়নাভিরাম বস্তু (যথা—সূর্যোদয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা) দর্শনে যে ভাবটি ইতিপূর্বেই অনুভূতিতে পেয়েছি সেই ভাবটিরই অনুভবেতে পুনর্জাগরণ ঘটে। সৌন্দর্য-বোধে এই ভাবানুষঙ্গই বিশেষ কার্যকরী হয়। অথচ এই অনুষঙ্গ আমাদের কাছে ঠিক স্পষ্ট হয় না—কারণ, ইহার কার্য আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। যেহেতু মনে করি যে আনুষঙ্গিক ভাবটির কারণ বর্তমান দৃষ্ট বস্তুটি—সেইহেতু বলা যায় যে তাহা আমাদের আরোপিত মাত্র। দৃষ্ট বস্তুটি তার কোনও ভঙ্গী দ্বারা আমাদের ইতিপূর্বেই জ্ঞাত কোনও ধারণা, অনুভব অথবা সংস্কারকে জাগ্রত করে তুলেছে। আমরা যখন উন্নত শিরে বুকে সাহস নিয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াই বা আর কারুকে সেরূপ দেখি—এক উন্নত ও নিভীক ভাব অনুভব করি মনে। পরে উন্নত পর্বত-শিখর দেখে মনে হয়—'কি গম্ভীর উন্নত এই পর্বত।' এভাবে পর্বতকে ঐ গুণগুলি দিয়ে ভূষিত করি। কিন্তু আমাদের ভাবের অনুষঙ্গ নিয়ে মোটেই সচেতন হই না।

'আরোপ-বাদ' সৌন্দর্য-বোধ সম্বন্ধে আমাদের কিছু তথ্য দেয় বটে কিন্তু তার সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং

আরোপ-বাদ সৌন্দর্যানুভূতির মতো একটি জটিল ব্যাপারের কয়েকটি জট খুলে দিতে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু আরোপ-বাদ সমগ্র ব্যাপারটি আমাদের বুঝাতে পারে না — আরোপ কেন করি তা বলতে পারে না এবং ভাবের সহিত বস্তুর কি সম্বন্ধ সে বিষয়েও কোনও আলোক-সম্পাত করতে পারে না। বিশেষতঃ আরোপ-বাদের অনেকগুলি শাখা হয়ে যাওয়াতে উহা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং আরোপ-বাদ দ্বারা সৌন্দর্য-দর্শনের কোনও বৃহৎ মীমাংসা হবে বলে মনে হয় না।

॥ কলা ও ক্রীড়া ॥

দার্শনিক কান্ট বলেন যে কলা-সৃষ্টি বা কলা-বোধে আমাদের কল্পনা এবং বুদ্ধি-বিচারের একটি স্বাধীন ক্রীড়া চলতে থাকে। কোনও বস্তুকে জানতে হলে তাকে কতকগুলি বুদ্ধি-ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়ে দেখতে হয়। তাতে কল্পনা বা বুদ্ধির স্বকীয়তার অবকাশ থাকে না। কিন্তু কোনও বস্তুর সৌন্দর্য উপভোগ করার সময়ে আমাদের আর বাধাঁ-ধরা ধারণাগুলির শরণাপন্ন হতে হয় না বরং কল্পনার দ্বারা অনেকখানিই অদল-বদল করতে পারি। জ্ঞান ও সৌন্দর্য-বোধ বা শিল্প-বোধের মধ্যে এই প্রভেদ সম্বন্ধে দার্শনিক কান্টের এই মতবাদটিকে জার্মান কবি ও দার্শনিক শীলার আর এক রূপে প্রচার করেন এবং বলেন মানুষের মধ্যে দুইটি দিক আছে—দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক। একমাত্র শিল্প-চর্চার মধ্য দিয়েই মানুষ তার সমগ্রতাকে ফিরে পায় এবং তার দুই দিকেই তৃপ্ত হয় ও সংযুক্ত হয়। সাধারণতঃ মানুষের এই দুইটি ভাগের মধ্যে বিরোধই চলতে থাকে। কারণ মানুষের আধ্যাত্মিকতা তার দেহের কামনা-বাসনাগুলির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শিল্পানুভূতির সময়ে এই বিরোধ একটি ঘনিষ্ঠ মিলনে পর্যবসিত হয় এবং সেই দুর্লভ মুহূর্তেই মানুষ আস্বাদন করে তার সত্যকার স্বাধীনতাকে। আর ঐ 'স্বাধীনতা' আর কিছুই নয় তার এক 'ক্রীড়া' করার অবস্থা। অন্য সময় মানুষ জগৎ-সংসারকে নিজ প্রয়োজনের জন্য দেখে। কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতির সময়ে সে সমগ্র জগৎকে খেলার

বিষয় বলে মনে করে এবং সে তখন অনাসক্ত ও যথার্থ স্বাধীন এবং সুখী হয়। সে তখন কোনও বস্তুর মনোহারিতা দেখে তাকে আকঁড়িয়ে ধরতেও যায় না আবার আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত হয়ে তাকে ঘৃণাও করে না। তখন সে শুধু তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে স্বীয় মানব-প্রকৃতির সমগ্র 'ক্ষুধা-তৃষ্ণা' ইন্দ্রিয়জ ও আধ্যাত্মিক-দুই-ই পুরাইয়া লয়। এই সময়ে সে যে সামঞ্জস্য-পূর্ণ আনন্দময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠে—সেটি তার ক্রীড়ার মনোভাবেরই সুফল। ভারতীয় দর্শনে 'পরমাত্মা'কে 'নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত' ও লীলাময় রূপে কল্পনা করা হয়েছে। শীলারের মতে মানুষ যখন তার জাগতিক ক্ষুদ্র ও বিভক্ত আশা-আকাঙ্খা হতে মুক্ত হয়ে এই লীলার চৈতন্যের শরণ নেয় তখন সে তার প্রকৃতির মধ্যে যে সব আপাত-বিরোধী বৃত্তিগুলি আছে—তাদের একটি মিলন বা সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয় এবং তখনই সে সত্যকার আনন্দ পায়। এই আনন্দ সৌন্দর্যানভূতি দ্বারাই প্রাপ্য।

আধুনিক কালেও এই ক্রীড়া-বাদ অনেক দার্শনিক মেনে নিয়েছেন এবং বলেন কলা-বিদ্ এমন এক ক্ষমতা রাখেন যে তাহা দ্বারা তিনি কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির চিন্তা না করেও নিজেকে ও ঐ সঙ্গে অপরকেও ভুলাইতে পারেন। কলা-বস্তু একটি খেলনার মতোই। তার কোনও ব্যবহারিক মূল্য নাই অথচ মানুষ ত্য হতে যথেষ্ট আনন্দ আহরণ করে নেয়।

ক্রীড়া-বাদের সমালোচনা করতে হলে প্রথমেই দেখে নিতে হবে যে ক্রীড়ার সহিত কলার মিল কোথায় কোথায়। অনুসন্ধানে তিনটি বিষয়ে কিছু মিল দেখা যায়—প্রথমতঃ এই দুই প্রকার ক্রিয়াই মানুষের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ করে না।

দ্বিতীয়তঃ এই দুই-ই বহির্জগৎকে বাস্তব বলে মানে না, বরং মায়া বা প্রতীয়মান বলে জানে।

তৃতীয়তঃ এই দুই প্রকার ক্রিয়া-দ্বারাই মানুষের উদ্বৃত্ত শক্তি নিষ্কৃতি পায়।

কিন্তু উপরোক্ত সাদৃশ্যগুলি সত্ত্বেও কলা ও ক্রীড়া একই বস্তু মনে করা

ভুল কারণ কতকগুলির বিষয়ে এই দুইটির বিরোধ আছে—যথা, প্রথমতঃ কলা-ক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই মূল্যবান বস্তুর সৃষ্টি হয়—যারা সাময়িক কল্পনাকে বিধৃত করে রাখে কিন্তু ক্রীড়া-ক্রিয়া দ্বারা এরূপ কিছু গড়ে ওঠে না বা পারেও না। দ্বিতীয়তঃ ক্রীড়ার মধ্যে কোনও সাধনা বা গাম্ভীর্য নাই। কিন্তু কলার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে কঠিন সাধনা আছে—তাহা ভুললে চলবে না। ক্রীড়াবাদীরা জীবনকে দুইভাগে বিভক্ত করে ভুলই করেন। কারণ জীবন ঐরূপ কর্ম ও ক্রীড়া—এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। পরন্তু, এমন অনেক ক্রিয়া আছে যেমন শিল্প-ক্রিয়া—যাহা একাধারে ক্রিয়া ও সাধনা দুই-ই বলা যায়।

॥ সুখ-বাদ ॥

অনেকে বলেন সৌন্দর্য সুখানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্য সমস্ত প্রকারের সুখই ক্ষণস্থায়ী—কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা যে সুখ ভোগ হয়—তাহা বহুকাল ধরে আমাদের চিত্তকে তৃপ্ত করে রাখে। কোন বস্তুর সৌন্দর্য কতোখানি তাহা আমাদের সৌন্দর্য-বোধের উপরই নির্ভর করে এবং এই বোধশক্তি কারুর বেশী—কারুর অল্প। সুতরাং সৌন্দর্য সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কোনও দুইটি মানুষের পক্ষে দুষ্কর। সৌন্দর্য-বোধ সম্বন্ধে আমার মতামত আমারই হবে। সেটি অপরের মতামতের সঙ্গে বস্তু-গত বিষয় নয়—তাহা আত্মগত।

আবার অনেকে বলেন 'সৌন্দর্য' নামক একটি গুণ আছে—কিন্তু সেটি আমাদের ব্যক্তিগত রুচি-বোধের ওপর একান্ত নির্ভরশীল নয়। কোনও বহির্বস্তুর কতকগুলি গুণ বিদ্যমান থাকলে তাহা স্বতঃই আমাদের চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগ্রত করে এবং তাহা সুখকর। আর যা কিছু যথার্থ সুন্দর তাহা সকলের কাছে সুন্দর বলে মনে হবে। আমাদের সকলের মধ্যেই সৌন্দর্যানুভূতি সমান—যেমন আছে অন্যান্য গুণ প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা (উদাহরণতঃ—রং, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি)।

আবার কয়েকজন বলেন যে সৌন্দর্য-বোধে যে সুখ জন্মে—তার কারণ স্নায়বিক মাত্র। আমাদের স্নায়ুমন্ডলী কোনও শব্দ বা দৃশ্য দ্বারা উত্তেজিত হয়ে উঠে অথচ আমরা মনে মনে জানি বাস্তবিক পক্ষে আমাদের করার কিছু নাই—এবং সেইহেতু আমাদের সেই উত্তেজনা কোনও বহির্কার্যে ব্যয় হয় না—যেমনটি না কি বাস্তব-জীবনে কিছু দেখলে বা শুনলে ঘটে থাকে। উদাহরণতঃ আমরা বাস্তব-জীবনে কোনও করুণ দৃশ্য দেখলে কষ্টই অনুভব করি এবং কি ভাবে দুর্গতকে সাহায্য করা যায় ভাবি বা সাহায্য করতে দৌড়ে যাই। কিন্তু যখন রঙ্গমঞ্চে কোনও করুণ দৃশ্য দেখি তখন আমরা কেবল করুণ রসটি উপভোগ করি এবং আমাদের স্নায়ু—মন্ডলীতে যে উত্তেজনা হয় তাহা শীঘ্র লয় পায় না—কারণ আমরা অন্য কোনও চিন্তায় বা কাজে সেটিকে প্রয়োগ করতে পারি না। এই উদ্বৃত্ত উত্তেজনা স্নায়ুমন্ডলীতে নৃত্য করতে থাকে এবং ইহাই সুখের কারণ। অতএব দেখা যায় যে সৌন্দর্য বা ললিত-কলার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন নাই এবং ইহার উপভোগ উদ্দেশ্য-বিহীন বা নিরাসক্ত। বাস্তব-জীবনে ইহা দ্বারা কোনও সুবিধা হয় না অথচ যথেষ্ট পরিমাণ সুখ পাওয়া যায়। যতোটা পরিমাণ নিরাসক্ত-চিত্তে আমরা সৌন্দর্যকে অন্তরে গ্রহণ করি ঠিক তত পরিমাণেই সৌন্দর্য্যও আমাদের সুখ দান করবে। যদি রাজ-হংসের 'মরাল-গমনে'র সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সহসা 'হংস-মাংসে'র রন্ধন-প্রণালী মনে পড়ে যায়—তাহলে আমাদের সৌন্দর্যানুভূতি আসক্তি-দোষে আবিল হয়ে পড়বে এবং সুখের পরিমাণও হ্রাস পাবে।

দেখা গেল—সুখ সৌন্দর্যানুভূতির অন্যতম একটি ফল এবং শুধু সুখের জন্য এই অনুভূতি আমরা চাই না। বস্তুতঃ, সৌন্দর্যের অনুভূতি হল 'আত্মপ্রকাশের' অনুভূতি। ইহার একটি বিশেষ রস আছে এবং সেটিকে সাধারণ সুখাবেশ বললে ভুল হবে। কারণ, কোনও সুস্বাদু খাদ্যের রসাস্বাদ করলে সুখ পাওয়া যায় তা আমরা জানি আবার একটি মনোরম কবিতা পড়লেও সুখ পাই। অথচ এই দুইটি অনুভবকে এক বলা যায় না। যদিও দুইটি ব্যাপারই সুখ দেয়—কিন্তু, ব্যাপার দুইটি এক নয়।

আমরা যেমন দৌড়ে এসে হাঁফিয়ে পড়ি আবার কোনও ভাস্কর-শিল্পী পাথরে কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে পড়েন। কিন্তু, সেজন্য কেউই বলবেন না যে দৌড়ানো আর পাথরে ভাস্কর্যের কাজ একই ব্যাপার।

॥ মনোবিকলন-বাদ ॥

মনো-বিকলন নামক যে নূতন মনস্তত্ত্ব আধুনিক কালে প্রচলিত—সেটির মতে আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলির মূলে আছে আদি-প্রবৃত্তি বা কাম-প্রবৃত্তি। কলা এই কাম-প্রবৃত্তিকে বাহিরে প্রকাশ করে মুক্তি দেয়। সাধারণতঃ, আমরা সামাজিক ও সাংসারিক নানা বাধাবশতঃ এই কাম-প্রবৃত্তিকে শাসন করে দমিয়ে রাখি কিন্তু স্বপ্নে মাঝে মাঝে ঐ প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। কলার মধ্য দিয়ে ঐ প্রবৃত্তিটির সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটিয়ে আমরা তার দৌরাত্ম হতে নিস্কৃতিলাভ করি। তাই দেখা যায় যে ললিত-কলা তখনই মনোরম লাগে যখন তাতে প্রেম ও কামনা বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। অবশ্য অন্যান্য ভাবের মধ্যেও — যেমন, ভয় ও করুণা—পরোক্ষ ভাবে কাম-বৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটে। কিন্তু প্রেম যখন কোনও কাব্যের বা উপন্যাসের মূল-বিষয় হয় তখন এই অভিব্যক্তি অনেক সময়েই অপরকে অবলম্বন করেই থাকে (বলা বাহুল্য প্রেমেরও অনেক স্তর আছে—স্থূল হতে সূক্ষ্ম হয়ে তারা ভগবৎ প্রেমে বিলীন হয়ে যায়)।

সুতরাং মনোবিকলন-বাদীদের মতে সৌন্দর্য আমাদের সুখ দেয় এই কারণেই যে সেটি আমাদের অন্তরের এক দুরন্ত বৃত্তিকে প্রকাশের পথ করে দেয়। এই প্রকাশ লাভ করে আমাদের অন্তর হাল্কা হয়। দুরন্ত কাম-প্রবৃত্তিকে শাসন করে দমিয়ে রাখতে আমাদের বেশ শক্তি ক্ষয় হয় এবং চিত্তের অবচেতন স্তরে শাসন ও শাসিতের সংঘর্ষ প্রকাশ হয়ে উঠে। সেই সময় কলা আমাদের বাঁচায় এবং আমরা তার মধ্য দিয়ে এই বৃত্তিটিকে চরিতার্থ করে থাকি। একটু সূক্ষ্ম ও অপরোক্ষ ভাবে—একটু উন্নত ও সুষ্ঠু ভাবে।

বলাবাহুল্য এই মতবাদ অনেকের কাছেই গ্রহণীয় হবে না — কারণ ঐ

কাম-বৃত্তিটি নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি অনেকেই অসহ্য মনে করবেন। কলার মধ্যে যে অনেক স্থলেই মানুষের অবদমিত কামনা চরিতার্থ করার পথ পাওয়া যায়—তা সত্য। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর সার্থক কলায় আমাদের (মানুষের) কামনার ভাবটির রূপান্তর ঘটে এবং তখন সেটিকে 'কামনা' বলা ভুল হয়। তখন সেই উন্নত পরিশোধিত ভাবটির প্রকাশে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাকে 'প্রকাশে'র বিশুদ্ধ ও নিজস্ব সৌন্দর্যই বলতে হবে এবং তাকে কাম-বৃত্তির দৌরাত্ম হতে নিষ্কৃতি পাবার আনন্দ বললে অন্যায় হবে। তাছাড়া কলায় আমরা অনেক এমন ভাব দেখতে পাই—যাদের সঙ্গে কাম-ভাবের সম্বন্ধ নাই বলতেই হবে। তাই মনোবিকলনবিদ্‌দের মতবাদ সর্বাংশে মেনে নেওয়া চলে না। হতে পারে মানুষের সমস্ত ভাবরাশিই সেই একই মূল-ভাবের উৎস হতে আসে—তবু সৌন্দর্য-দর্শনে সেই মূল-ভাবটিকে বড়ো করে দেখার প্রয়োজন নাই। কারণ শাখা-প্রশাখা পত্র-পুষ্পের বিচিত্র রূপ-লাবণ্যে সুগন্ধের বিপুল গুণাবলীতে মূলকান্ড হতে প্রায়ই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন।

নবম অধ্যায় ঃ

শিল্পের সামাজিক মূল্য

সৌন্দর্য-দর্শনের এই আলোচনায় শিল্পকে সমাজের কোনও প্রয়োজন-সাধনের উপায় বলে গ্রহণ করা হয়নি। শিল্প-বৃত্তি বা সৌন্দর্য-বোধকে একটি স্বতন্ত্র মানসিক ক্ষমতা বা গুণ বলেই দেখা হয়েছে। এই মতবাদটি প্রথম ইটালীর প্রখ্যাত সৌন্দর্য-দার্শনিক ক্রোচে (যাঁর সৌন্দর্য-দর্শন য়ুরোপীয় ভাবধারাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করেছে) বিশেষ জোর দিয়া বলেন এবং বর্তমানে অনেকেই তাহা মেনে নিয়েছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকে 'ব্যবহারিক' বলে মনে করেন না। যেমন, রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সম্বন্ধে বলেন 'যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার (মানুষের) উপভোগের লক্ষ্য; যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফলভোগের অত্যাবশ্যকতাকে বিস্মৃত হয়ে যায়' (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৪৭)। এখানে তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে শিল্প যদি সমাজের কোনও উপকারে না লাগে তো তাকে সমাজ সমর্থন কেন করবে? বিশেষতঃ এমন সময়ে যখন সমাজ তার দৈনন্দিন জীবনের অভাবগুলিই মেটাতে পারছে না—তখন শিল্পের কি প্রয়োজন? তখন শিল্পীরা তো সমাজের এমন কোনও কাজে নেমে পড়েন না—যার দ্বারা সমাজের সত্যকারের উপকার হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো অনেকে বলবেন যে কারুশিল্প তো শিল্পেরই অঙ্গ এবং ইহা দ্বারা সমাজের উপকার হয়ে আসছে—তাঁতী, কুমোর, রাজ-মিস্ত্রী, ছুতার-মিস্ত্রী এঁরা তো 'কাজের কাজই' করেন। কিন্তু, এ উত্তরে আমরা ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারব না কারণ শিল্পের যথার্থ স্বরূপ চারুশিল্প অর্থাৎ ললিত-কলায় এবং সেটিতে নিছক ভাব-প্রকাশের আকুতিই আছে। কোনও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই।

এই 'চারু-শিল্পী'রাই যথার্থ শিল্পী এবং তাঁরা সমাজের কি উপকারে লাগেন ইহাই প্রশ্ন। মহাপণ্ডিত প্লেটোর মতে চারু-শিল্পীদের সমাজে স্থান হতে পারে না—কারণ, তাঁরা অলস কল্পনা-বিলাসী এবং মিথ্যা অনুকরণ নিয়ে সময় কাটায় ও অপরকে ভোলায়। কিন্তু আমরা প্লেটোর মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারি না। তাহলে শিল্প ও শিল্পীর মানব-সমাজে অবস্থানকে মঙ্গলের বলে প্রমাণ করতে পারি? প্রথমেই বলা যায় মানুষের যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা-বোধ আছে এবং মানুষকে তাহা তৃপ্ত করতে হয় ঠিক তেমনই আছে মানুষের ভাবাবেগ—যাহা প্রকাশ চায়। এই প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং শিল্পী এই প্রকাশ-কার্যে সহায়তা করেন। আমাদের মনের মধ্যে যখন কোনও দুঃখ গুমরিয়ে ওঠে কিন্তু আমরা সেটিকে প্রকাশ করতে সমর্থ হই না—এমন কি সেটির অবস্থান সম্পর্কেও সচেতন থাকি না। অথচ মন সদাই অশান্ত ও উদাস হয়ে আছে (কেন সঠিক জানি না)—এমন সময়ে যদি শুনি কোনও ব্যথার সুরের গান (যে গানটি এক মরমী কবি বেঁধেছেন) গাইছেন এক দরদী গায়ক—অমনি যেন আমাদের অন্তর ঐ গানের মধ্য দিয়ে আপন ব্যথাটিকে বাহিরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়—যেন আমাদের মনের ভাবটি ভাষা পায়। এই আত্মপ্রকাশের পর মানুষের হৃদয় আবার স্বচ্ছন্দ হয়। যদি কেহ বলেন এইরূপ ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় এবং শিল্পই এই সব ভাবগুলিকে জাগ্রত করে—তাহলে বলতে হয় এটি ভুল ধারণা, কারণ জীবনে ভাবাবেগ এসে অন্তরকে চঞ্চল করবেই। জীবন মাত্রেরই আছে সুখ, দুঃখ, প্রেম, মিলন-বিরহ ইত্যাদির দোলা। যাদের এইসব ভাবোদয় হয় না—তারা স্বাভাবিক মানুষ নয়। মানব-জীবনে এইসব অনুভূতিই তো মূল্যবান—এবং ইহাদের অভাবে মানুষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ, মানুষ কোন কোন অভিজ্ঞতায় এমনই ভাব-চঞ্চল হয়ে ওঠে যে তার উপযুক্ত প্রকাশের অভাবে সে উন্মত্ত অধীর হয়ে নানা অসামাজিক উপায়ে চিত্তকে শান্ত করতে চায়। সেই সময় শিল্প ও সৌন্দর্য-বোধের মানব-জীবনে কতো প্রয়োজন বোঝা যায়। বজ্রসম শোকাহত মানুষ নিজেকে ভুলিয়ে

রাখতে পারে শিল্পরুচি ও শিল্পবোধকে অবলম্বন করে। এই দুইটির অভাবে অনেকেই হয় উন্মার্গগামী বা মদের টানে রসাতলগামী। ব্যর্থ প্রেমিক বহু যুবক সুরাপানে বা আরও অন্ধকার পাপের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো উপযুক্ত সৌন্দর্য-বোধ থাকলে তারা হয়তো সার্থক প্রেমের কবিতা রচনায় অন্তরের ভাব প্রকাশ করে হৃদয়ে আর এক আনন্দের পূর্ণতা-লাভ করে। সুতরাং দেখা যায় ভাবাবেগ কি প্রকারে রুদ্ধ রাখা যায়—সে উপায় না চিন্তা করে বরং ভাবাবেগের প্রকাশের পথ মুক্ত রাখার প্রয়াসই যুক্তিযুক্ত।

প্রকাশ-কার্যদ্বারা মানুষ তার ভাবানুভূতির কষ্টকর ও বন্ধভার হতে মুক্তি পায়; যে ভাবাবেগ অন্তরের অন্তঃস্থলে নিয়ত গুমরে মরে জীবন শান্তিহীন করে তোলে—মানুষ তাকেই বাহিরে এনে মনন করে। সে তখন দ্রষ্টা হয় এবং দুঃখের বদলে আনন্দ পায়। এই প্রকাশ-কার্যের মস্ত সহায়ক মানুষের শিল্প-চর্চা।

শিল্প দ্বারা আপনার ভাবটি প্রকাশ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা যেমন একা থেকেও হতে পারে, তেমন আবার অনেকের মধ্যে থেকেও হতে পারে। অনেক জনের মধ্যে অবস্থিত থেকে যখন অন্তরের কোনও দুঃসহ ভাবের প্রকাশ হতে থাকে—তখন, আনন্দের মাত্রা অধিক হয়। কারণ, তখন মনে হয় যে অপর সকলেও যেন আমার প্রতি সহানুভূতিযুক্ত। যেমন কোনও তরুণ যুবা তার প্রণয়-কাহিনী নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ব্যক্ত করে আনন্দ পায় বা কোনও সংসার-ক্লান্ত বৃদ্ধ তার দুঃখ-তাপের কথা আর কোনও সমব্যথী বৃদ্ধ সঙ্গীকে বলে মনোভাব লাঘব করে স্বস্তি পায় —তেমনই, শিল্প-বস্তুকে যখন অনেকে মিলে অনুভব করেন তখন প্রত্যেকেই অপরের সহিত একটি সমবেদনার সম্পর্ক অনুভব করেন এবং করেন বলে অনেক তৃপ্তি তাঁদের মন ভরে দেয়। এই কারণেই স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গীত বা ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক সঙ্গীতের সমবেত সাধনার এত প্রচলন।

টলস্টয়ের মতে ললিত কলার প্রত্যক্ষ উপকারই হল তার মানুষে-মানুষে সংযোগ ঘটানো। যখন একই শিল্প-বস্তুকে আমরা অনেকে মিলে উপভোগ

করি—তখন আমাদের মধ্যে একটি বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। আমাদের সকলের প্রাণের কথাটি ঐ শিল্প-বস্তুতে ফুটে উঠেছে এমন বোধটি জাগায় —আমাদের নিজেদের মধ্যেও যেন প্রাণে প্রাণে মিল হয়ে যায়। অতএব সমাজের সংহতির জন্য ললিতকলার প্রয়োজন আছে। তাই প্রসঙ্গতঃ বলা চলে সেই প্রকারের কলারই বিশেষ অনুশীলন হওয়া উচিত যাহা সার্বজনীন এবং অনেককে একত্র মিলাতে সমর্থ।

কল্পনা-শক্তি বিকাশেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। অনেকে এই বিকাশকে বিলাস বলে উড়িয়ে দিতে চান এবং এর উপকারিতা কোনখানে তা বুঝতে চেষ্টা করেন না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে মানুষ যদি কল্পনা-শক্তি হারায়—তাহলে সে সত্যকার 'মানুষ' হতে পারে না। যে কেবল কাজ বোঝে—কিসে 'লাভ' আর কিসে 'ক্ষতি'—এই হিসাব বই জানে না, তার দ্বারা কোনও বড়ো বা মহৎ কাজ হয় না। বড় ব্যবসার পত্তন করা বা কারখানা খোলা—এমন কি এইসব 'বৈষয়িক' কাজের জন্যও কল্পনার প্রয়োজন। কারণ নতুন কিছুর ছবি প্রথমে মনে না আসলে এবং সেই নতুন কিছুর 'আবেগ' না জাগ্রত হলে কোনও নতুন বড় কাজে নামা যায় না। শিল্প এই কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত ও উন্নত করতে সহায়তা করে। আমাদের কষ্টার্জিত জ্ঞানও কল্পনার অভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তখন ঐ বহু পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান শুধু গ্রন্থগত বিদ্যাই হয়ে যায়। কারণ সজীব কল্পনাই শুধু বিদ্যা চর্চা ও জ্ঞানানুশীলনকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার নানা প্রয়োগ বাহির করতে পারে। আমাদের বিচার-বুদ্ধি কল্পনার অভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। যাহা আমরা জানি অথচ কল্পনা করতে পারি না—তাহা শুধুই ভার হয়ে থাকে, কোনও আনন্দ দেয় না। সুতরাং জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা-শক্তি যাতে বাড়ে তার সাধনা করা উচিত। অর্থাৎ শিল্প-চর্চা করা কর্তব্য।

উত্তমরূপে কাজ করতে হলে কেবল কাজে মেতে থাকলেই হয় না বরং কাজ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেটিকে নিরাসক্ত চিত্তে দেখবার শিক্ষাও থাকা চাই। কারণ কাজের সময় আসক্তি থাকে এবং সমস্তটিকে

এক নজরে দেখা যায় না। নিরাসক্ত ও নিঃস্বার্থ অবস্থায় বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকে—তখন যতখানি দেখা বা বোঝা যায়—ততখানি অন্য সময়ে যায় না। যাঁরা কর্মী তাঁদের কর্ম-কৌশলের একটি কৌশলই এই যে তাঁরা কাজ হতে মনকে সরিয়ে নিতে পারেন এবং কিছুক্ষণের জন্য একেবারে কাজকে ভুলে থাকতে পারেন। তখন হয়তো তাঁরা গান শুনছেন, চিত্র-প্রদর্শনীতে ঘুরছেন অথবা নাট্যাভিনয় উপভোগ করছেন। তা বলে তাঁদের এই সময়টি ব্যর্থ যায় না বরং এই অবকাশ-সময়টিতে তাঁদের মন-বুদ্ধির প্রসার বিস্তৃততর হয় এবং এই সময়কার নির্লিপ্ত মনে যখন তাঁরা কাজের কথা ভাবেন—তখন ঐ সম্পর্কে অনেক নূতন কথা বা কল্পনা (Idea) তাঁদের মাথায় আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন উৎসাহ বা প্রেরণাও প্রাণে জাগরূক হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে বিশ্বের কর্ম-জগতের কর্মীদের সৌন্দর্যানুভূতির প্রয়োজন নাই বা তাদের কাছে ললিত-কলা নিরর্থক। শিল্প শুধু এদের অবসর-বিনোদনই করে না—উপরন্তু তাঁদের কর্ম-প্রেরণাকে সজীবতর করে তোলে। শিল্পচর্চা মানুষকে যে অনাসক্ত আনন্দের শিক্ষা দেয়—তাতে জাগ্রত হয় চিত্তের উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ—কর্মের দিক দিয়ে যেমন সত্য, আবার মানুষের সুখ-শান্তির দিক দিয়েও তেমনই সত্য। যেহেতু শিল্প-বস্তু কোনও বাস্তব-বস্তু নয় এবং ইহা কোনও সাংসারিক প্রয়োজনে লাগে না তাই শিল্প-চর্চা মানুষকে পরোক্ষভাবে আনন্দের মধ্য দিয়ে অনাসক্তি শিক্ষা দেয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন 'অনাসক্ত কর্মই উত্তম।' এই 'উত্তমতা' মানুষের জীবনে ধর্মে-কর্মে এবং সকল দিকেই সত্য। যে অনাসক্তি হতে এই উত্তমতা আসে সেই অনাসক্তির প্রথম শিক্ষা আমরা ললিত-কলা হতে গ্রহণ করতে পারি এবং তাহা কর্মের অন্তরায় না হয়ে বরং সহায় হয়।

সুতরাং মানব-সমাজে শিল্পের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে এবং শিল্প-সাধনাকে বিলাস বলাও সঙ্গত হয় না। সুস্থ সামাজিক চেতনায় শিল্পের স্থান বিশিষ্ট।